যুগবাণী

কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকা : ড. রহমান হাবিব

যুগবাণী

কাজী নজরুল ইসলাম

আরো বই সংগ্রহ করুন

কিন্ডল বাংলা

https://kindlebangla.com

কিন্ডলবাংলা যদিও একটি ডিজিটাল লাইব্রেরী, কিন্ডলবাংলা তার সম্মানিত পাঠকদের বইয়েরে হার্ডকপি কিনে পড়ার জন্য সুপারিশ করে। যাতে লেখক এবং প্রকাশক উভয়েরেই স্বার্থ রক্ষিত হয়।

আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?

এ প্রশ্নের সর্বপ্রথম উত্তর, আমরা চাকুরিজীবী। মানুষ প্রথম জন্মে তাহার প্রকৃতিদত্ত চঞ্চলতা, স্বাধীনতা ও পবিত্র সরলতা লইয়া। সে চঞ্চলতা চিরমুক্ত, সে স্বাধীনতা অবাধগতি, সে সরলতা উন্মুক্ত উদার। মানুষ ক্রমে যতই পরিবারের গণ্ডি, সমাজের সংকীর্ণতা , জাতির – দেশের ভ্রান্ত গোঁড়ামি প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাড়িতে থাকে, ততই তাহার জন্মগত মুক্ত প্রবাহের ধারা সে হারাইতে থাকে, ততই তাহার স্বচ্ছপ্রাণ এই সব বেড়ির বাঁধনে পড়িয়া পঙ্কিল হইয়া উঠিতে থাকে। এসব অত্যাচার সহিয়াও অন্তরের দীপ্ত স্বাধীনতা ফুটিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু পরাধীনতার মতো জীবন হননকারী তীব্র হলাহল আর নাই। অধীনতা মানুষের জীবনীশক্তিকে কাঁচাবাঁশে ঘুণ ধরার মতো ভুয়া করিয়া দেয়। ইহার আবার বিশেষ বিশেষত্ব আছে, ইহা আমাদিগকে একদমে হত্যা করিয়া ফেলে না, তিল তিল করিয়া আমাদের জীবনী-শক্তি, রক্ত-মাংস-মজ্জা, মনুষ্যত্ব, বিবেক সমস্ত কিছু জোঁকের মতো শোষণ করিতে থাকে॥ আখের কল আখকে নিঙরাইয়া পিষিয়া যেমন শুধু তাহা শুষ্ক ছ্যাবা বাহির করিয়া দিতে থাকে, এ অধীনতা মানুষকে – তেমনই করিয়া পিষিয়া তাহার সমস্ত মনুষ্যত্ব নিঙড়াইয়া লইয়া তাহাকে ওই আখের ছ্যাবা হইতেও ভুয়া করিয়া ফেলে। তখন তাহাকে হাজার চেষ্টা করিয়াও ভালোমন্দ বুঝাইতে পারা যায় না। আমাদেরও হইয়াছে তাহাই। আমাদিগকে কোনো স্বাধীনচিত্ত লোক এই কথা বুঝাইয়া বলিতে আসিলেই তাই আমরা সাফ বলিয়া দিই, ‘এ লোকটার মাথা গরম!’

সারা বিশ্বে বাঙালির এই যে সকল দিকেই সুনাম, কিন্তু তবুও আমরা কেন এমন দিনদিন মনুষ্যত্ব বর্জিত হইয়া পড়িতেছি? কেন ভণ্ডামি, অসত্য, ভীরুতা, আমাদের পেশা হইয়া পড়িয়াছে? কেন আমরা কাপুরুষের মতো এমন দাঁড়াইয়া মার খাই? ইহার মূলে ওই এক কথা, আমরা অধীন – আমরা চাকুরিজীবী। দেখাইতে পার কী, কোন্ জাতি চাকুরি করিয়া বড়ো হইয়াছে? আমরা দশ-পনেরো টাকার বিনিময়ে মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা

অনায়াসে প্রভুর পায়ে বিকাইয়া দিব, তবু ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত দিব না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিব না। এই জঘন্য দাসত্বই আমাদিগকে এমন ছোটো হীন করিয়া তুলিতেছে। যে দশ টাকা পায়, সে যদি পাড়াগেঁয়ে গিয়া অন্তত মুদি, ফেরিওয়ালার ব্যবসা করে, তাহা হইলেও সে বিশ-পঁচিশ টাকা অনায়াসে উপার্জন করিতে পারে। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়, আদতে আমরা ইচ্ছাই করিব না, চেষ্টাই করিব না, হইবে কোথা হইতে? যে জাতির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প যত বেশি, সে জাতির মধ্যে স্বাধীন-চিত্ত লোকের সংখ্যা তত বেশি। আর কাজেও যে-জাতির জনসংঘের অধিকাংশেরই চিত্ত স্বাধীন, সে জাতি বড়ো না হইয়া পারে না। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি।

আমরা আজ অনেকটা জাগ্রত হইয়াছি, আমরা মনুষ্যত্বকে এক আধটুকু বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদের এ মনুষ্যত্ববোধ, এ শক্তি স্থায়ী হইতেছে না, শুধু ওই চাকুরি-প্রিয়তার জন্য। সোডা-ওয়াটারের মতো আমাদের শক্তি, আমাদের সাধনা, আমাদের অনুপ্রাণতা এক নিমেষে উঠিয়াই থামিয়া যায়, শোলার আগুনের মতো জ্বলিয়াই নিবিয়া ছাই হইয়া যায়। আমরা যদি বিশ্বে মানুষ বলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাই, তবে আমাদের এ শক্তিকে, এ সাধনাকে স্থায়ী করতে হইবে, নতুবা ‘যে তিমিরে সে তিমিরে!’ এবং তাহা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে আমাদিগকে চাকুরি ছাড়িয়া পর পদলেহন ত্যাগ করিয়া স্বাধীনচিত্ত উন্নতশীর্ষ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। দেখিয়াছ কি চাকুরিজীবীকে কখনও স্বাধীনচিত্ত সাহসী ব্যক্তির মতো মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে? তাহার অন্তরের শক্তিকে যেন নির্মমভাবে কচলাইয়া দিয়াছে ওই চাকুরি, অধীনতা, দাসত্ব। আসল কথা, যতক্ষণ না আমরা বাহিরে স্বাধীন হইব, ততক্ষণ অন্তরের স্বাধীনশক্তি আসিতেই পারে না।

উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন

হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

-রবীন্দ্রনাথ

আজ আমাদের এই নূতন করিয়া মহাজাগরণের দিনে আমাদের সেই শক্তিকে ভুলিলে চলিবে না – যাহাদের উপর আমাদের দশ আনা শক্তি নির্ভর করিতেছে, অথচ আমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সে হইতেছে, আমাদের দেশের তথাকথিত ‘ছোটোলোক’ সম্প্রদায়। আমাদের আভিজাত্য-গর্বিত সম্প্রদায়ই এই হতভাগাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনো যন্ত্র দিয়া এই দুই শ্রেণির লোকের অন্তর যদি দেখিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, ওই তথাকথিত ‘ছোটোলোক’-এর অন্তর কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, এবং ওই আভিজাত্যগর্বিত তোমাদের ‘ভদ্রলোকের’ অন্তর মসিময় অন্ধকার। এই ‘ছোটোলোক’ এমন স্বচ্ছ অন্তর, এমন সরল মুক্ত উদার প্রাণ লইয়াও যে কোনো কার্য করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এই ভদ্র সম্প্রদায়ের অত্যাচার। সে-বেচারা জন্ম হইতে এই ঘৃণা, উপেক্ষা পাইয়া নিজেকে এত ছোটো মনে করে, সংকোচ জড়তা তাহার স্বভাবের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যায় যে, সেও যে আমাদেরই মতো মানুষ – সেও যে সেই এক আল্লাহ্-এর সৃষ্টি, তাহারও যে মানুষ হইবার সমান অধিকার আছে, – তাহা সে একেবারে ভুলিয়া যায়। যদি কেউ এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে, অমনই আমাদের ভদ্র সম্প্রদায় তাহার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। এই হতভাগাদিগকে – আমাদের এই সত্যিকার মানুষদিগকে আমরা এই রকম অবহেলা করিয়া চলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত অধঃপতন; তাই আমাদের

দেশে জনশক্তি বা গণতন্ত্র গঠিত হইতে পারিতেছে না। হইবে কীরূপে? দেশের অধিবাসী লইয়াই তো দেশ এবং ব্যক্তির সমষ্টিই তো জাতি। আর সে দেশকে, সে জাতিকে যদি দেশের, জাতির সকলে বুঝিতে না পারে, তবে তাহার উন্নতির আশা করা আর আকাশে অট্টালিকা নির্মাণের চেষ্টা করা একই কথা। তোমাদের এই আভিজাত্যগর্বিত, ভণ্ড, মিথ্যুক, ভদ্র সম্প্রদায় দ্বারা – (যাহাদের অধিকাংশেরই দেশের, জাতির প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা নাই) মনে কর কী দেশ-উদ্ধার হইবে, জাতিগঠন হইবে? তোমরা ভদ্র সম্প্রদায়, মানি, দেশের দুর্দশা, জাতির দুর্গতি বুঝ, লোককে বুঝাইতে পার এবং ওই দুর্ভাগ্যের কথা কহিয়া কাঁদাইতে পার, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামিয়া কার্য করিবার শক্তি তোমাদের আছে কি? না, নাই। এ-কথা যে নিরেট সত্য, তাহা তোমরাই বুঝ। কাজেই তোমাদের এই দেশকে, জাতিকে উন্নত করিবার আশা ওই কথাতেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যদি একবার আমাদের এই জনশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পার, তাহাদিগকেও মানুষ বলিয়া ভাই বলিয়া কোল দিবার তোমার উদারতা থাকে, তাহাদিগের শক্তির উন্মেষ করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে তুমি শত বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা সত্ত্বেও যে-কাজ করিতে পারিতেছ না, একদিনে সেই কাজ সম্পন্ন হইবে। একথা হয়তো তোমার বিশ্বাস হইবে না, কিন্তু এই সেদিনকার সত্যাগ্রহ, হরতালের কথা মনে কর দেখি, – একবার মহাত্মা গান্ধির কথা ভাবিয়া দেখো দেখি! তিনি আজ ভারতে কী অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছেন।

তিনি যদি এমনই করিয়া প্রাণ খুলিয়া ইহাদের সহিত না মিশিতেন, ইহাদের সুখ-দুঃখের এমন করিয়া ভাগী না হইতেন, ইহাদিগকে যদি নিজের বুকের রক্ত দিয়া, তাহারা খাইতে পাইল না বলিয়া নিজেও তাহাদের সঙ্গে উপবাস করিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত আপনার করিয়া না তুলিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে কে মানিত? কে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত? কে তাঁহার একটি ইঙ্গিতে এমন করিয়া বুক বাড়াইয়া মরিতে পারিত? তাঁহার আভিজাত্য-গৌরব নাই, পদ-গৌরবের অহংকার নাই, অনায়াসে প্রাণের মুক্ত উদারতা লইয়া তোমাদের ঘৃণ্য এই 'ছোটোলোক'-কে বক্ষে ধরিয়া ভাই বলিয়া ডাকিয়াছেন, – সে-আহ্বানে জাতিভেদ নাই, ধর্মভেদ নাই, সমাজ ভেদ নাই, – সে যে ডাকার মতো ডাক, – তাই নিখিল ভারতবাসী, এই উপেক্ষিত হতভাগারা তাঁহার দিকে এত হাহা করিয়া ব্যগ্রবাহু মেলিয়া ছুটিয়াছে। হায়, তাহাদের যে আর কেহ কখনও এমন করিয়া এত বুকভরা স্নেহ দিয়া আহ্বান করেন নাই! এ মহা-আহ্বানে কী তাহারা সাড়া না দিয়া পারে? যদি পার, এমনি করিয়া ডাকো, এমনি করিয়া এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন করো – দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে। ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার, মানুষকে মানুষ হইয়া ঘৃণা করিবার তোমার কী অধিকার আছে? ইহা তো আত্মার ধর্ম নয়। তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর, এর একই মহা-আত্মার অংশ। তোমার জন্মগত অধিকারটাই কী এত বড়ো? তুমি যদি এই চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে তোমার মতো ভদ্রলোকদের দেওয়া এই সব হতাদর উপেক্ষার আঘাত, বেদনার নির্মমতা একবার কল্পনা করিয়া দেখো দেখি, – ভাবিতে তোমার আত্মা কি শিহরিয়া উঠিবে না?

আমরা ভারতবাসীরাই শুধু আত্মার এত অবমাননা করিতে সাহস করি, আর তাই আমাদের শোচনীয় অধঃপতন, – তাই বিশ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার আমাদের স্থান নাই। এই আত্মার অপমানে, যে সেই অনাদি অনন্ত মহা-আত্মারই অপমান করা হয়। ভয়ে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে না কি? খোদার সৃষ্ট – তাঁহার আনন্দের বিকাশস্বরূপ এই মানুষকে ঘৃণা করিবার অধিকার তোমায় কে দিয়াছে? তোমাকেই বা বড়ো হইবার অধিকার কে দিয়াছে, তুমি কীসের জন্য ভদ্র বলিয়া মনে কর? এসব যে তোমারই নিজের সৃষ্টি, – খোদার উপর খোদকারি। এ মহা-অপরাধের মহাশাস্তি হইতে তোমার রক্ষা নাই, – রক্ষা নাই। মানুষের প্রতি এই যে হিংসা, দ্বেষ, তোমার দেশের, গাঁয়েরে প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি

এই যে অকারণ ঘৃণা, আক্রোশ, ইহাই তোমার মূর্খের বর্ণ কালো করিয়া দিয়াছে – তোমার চেহারায় কালি ছড়াইয়া দিয়াছে। মরিতে তো বসিয়াছ, – যদি এখনও এই মৃত হতভাগ্যদের হাত ধরিয়া না উঠিয়া একা উঠিতে যাও, তবে আরও মার খাইয়া মরিবে। কীসের পতিত ইহারা? ইহাদের প্রাণ যত উন্মুক্ত – ইহাদের অন্তর যেমন সরল, – তুমি কি সেরকম হইতে পার? হইতে পারে অশিক্ষিত সে, কিন্তু ইহার প্রাণ তোমার চেয়ে অনেক বড়ো, সে প্রাণে বিরাট বিপুল শক্তি-সিংহ সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, – যদি পার সেই শক্তিকে জাগাও।

আমাদের এই পতিত, চণ্ডাল, ছোটোলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদেরই মতো দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমারও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চশিরে ভারতের বুকে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে। এসো, আমাদের উপেক্ষিত ভাইদের হাত ধরিয়া আজ ভারত-বেদির সামনে দাঁড়াইয়া বোধন-বাঁশিতে সুর দিই –

‘কীসে দুঃখ, কীসের দৈন্য,

কীসের লজ্জা, কীসের ক্লেশ!’

কালা আদমিকে গুলি মারা

একটা কুকুরকে গুলি মারিবার সময়ও এক আধটু ভয় হয়, যদিই কুকুরটা আসিয়া কোনো গতিকে গাঁক করিয়া কামড়াইয়া দেয়! কিন্তু আমাদের এই কালা আদমিকে গুলি করিবার সময় সাদা বাবাজিদের সে ভয় আদৌ পাইতে হয় না। কেন না তাহারা জানে যে, আমরা পশুর চেয়েও অধম। একবার এক সাহেবের গুলির চোটে আমাদের স্বগোত্র এক কালা আদমি মারা যায়, তাহাতে সাহেব জিজ্ঞেস করেন ‘কৌন্ মারা গিয়া?’ একজন আসিয়া বলিল, ‘এক দেহাতি আদমি হুজুর!’ সাহেব দিব্যি পা ফাঁক করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ‘ওঃ, হাম সমঝা থা, কোই আডমি!’ অর্থাৎ ওই গ্রাম্য বেচারা সাহেবের বিড়াল-চোখে মানুষই নয়। মনুষ্যকে এত বড়ো ঘৃণা আর কেহ কোথাও প্রদর্শন করিতে পারে কি-না, জানি না। ইহার পরাকাষ্ঠা দেখানো হইয়াছে জালিয়ানওয়ালাবাগে ও অন্যান্য স্থানে। আবার এই সেদিনও তাহারই পুনরভিনয় হইল কালিকটে। নিরস্ত্র জনসংঘ – যাহাদের হাতে একটু বে-মানানসই বংশখণ্ড দেখিলেও অস্ত্র-আইনের কব্জায় আসে, তাহাদিগের প্রতি গুলি চালাইয়া কী ঘৃণ্য কাপুরষতাই না দেখাইতেছে এই গোরার দল! কিন্তু এসব বর্বরতার জন্য দায়ী কে?

খোদ কর্তাই নন কি? ‘মাকড় ধরলে ধোকড় হয়’ নীতিকে কী গবর্নমেন্টই প্রশ্রয় দিতেছে না? এই সব মনুষ্যত্ব-বিবর্জিত খুন-খারাবি যে যত করিতে পারিবে, তার তত পদোন্নতি, তত চাপরাশ বৃদ্ধি সরকারের দরবারে। অথচ সাধারণকে বলা যাইতেছে, দোষ আমাদের নয় ইত্যাদি। যদি তাই হয়, তবে এই অবাধ হত্যা – নিরস্ত্র নির্দোষ জনসংঘের উপর হাসিতে খেলিতে গুলি চালানো ব্যাপারটাকে নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিলে গবর্নমেন্ট তাহাতে বাধা দেয় কেন? বা সাধারণের কথায় কর্ণপাতই বা করে না কেন? এই একগুঁয়েমির জন্যই তো আজ এমন করিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত একটা বিপুল কম্পন শুরু হইয়া গিয়াছে। এই ভূমিকম্পকে চাপা দিয়া রাখিবার ক্ষমতা আর স্বেচ্ছাতন্ত্রের নাই। তেত্রিশ কোটি মানুষকে অবহেলা করিয়া, ঘৃণা করিয়া তিন শত লোক তাহাদিগকে চাবুক মারিবে এবং তাহারা তাহা সহিয়া থাকিবে, সে দিন আর নাই। নেহাত অসহ্য না হইয়া পড়িলে মানুষ বিদ্রোহী হয় না। শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ যে কত কষ্ট,

কত যন্ত্রণায় তবে অশান্তকে বরণ করিয়া লয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিবে না; এখন মনুষ্যত্ব না জাগুক, অন্তত এই পশুত্বটুকুও আমাদের মনে জাগিয়াছে যে, মনুষ্যত্বের অপমান সহার মতো পাপ আর নাই। এ শিক্ষাও আমাদের ঠেকিয়া শিখিতে হইতেছে।

আমাদের সব কথাই ভুয়ো – কর্তাদের নিমক-হালাল ছেলেগুলির কাছে। এই সেদিন মি. শাস্ত্রী একটা সোজা কথা লাট-দরবারে পেশ করিয়াছিলেন যে, লোকগুলোকে মারিবার সময় একটু বুঝিয়া-সুঝিয়া মারিও। কিন্তু চোর না শুনে ধর্মের কাহিনি! বলা বাহুল্য, তাঁহার এ আরজি বাতিল ও না-মঞ্জুর হইয়া গেল! কালা আদমিকে মারিবে, তাহার আবার বুঝিয়া-সুঝিয়া কী? ইচ্ছা হইল, না – বাস, চালাও গুলি! মি. শাস্ত্রী সাতটি কথা পেশ করিয়াছিলেন এবং তাহার যে-কোনোটি সম্বন্ধে সরকারের অতি বড়ো নিমক-হালালেরও কোনো কিছু বলিবার ছিল না। অন্তত আমরা তাহাই মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু 'লোকদিগকে আগে সাবধান করিয়া দিয়া তবে গুলি ছুঁড়িবে' – উপদেশটি ব্যতীত আর প্রায় সব কটিই নাকচ হইয়া গিয়াছে। মি. শাস্ত্রীর পাণ্ডুলিপিতে মোটামুটি এই কথা কটি ছিল :- প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে লিখিত হুকুম লইতে হইবে। ম্যাজিস্ট্রেট না থাকিলে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হুকুম দিবেন, কিন্তু সকল দায়িত্ব তাঁহার এবং তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, গুলি না চালাইলে বহু প্রাণহানি ও ক্ষতি হইত ইত্যাদি। আরো কয়েকটি এই রকম সহজ কথা। কিন্তু কালা আদমি মারিতে এত সব বাঁধাবাঁধি নিয়ম-কানুন! বাপ! বলে কী? অতএব মি. শাস্ত্রীর কথা এক ফুঁয়ে উড়িয়া গেল!

আর শুধু এ সাদাকেই দোষ দেওয়া বৃথা। দোষ আমাদেরই। কিন্তু সেসব বলিতে গেলে সাদা দাদারা ভয়ানক রকমের চটিতং হইয়া যাইবেন এবং ক্রমান্বয়ে আমাদের মুখ বন্ধ, (হাত বন্ধ তো আছেই।) পা বন্ধ – শেষকালে কাঁচা মুণ্ডটাও খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিবেন! 'হক কথায় আহাম্মক রুষ্ট' – তাই আমাদের অতি সোজা কথাটাও আইন বাঁচাইয়া বাঁকা-টেরা করিয়া বলিতে হয়। আজও সাদাদের এই গুলি মারা লইয়া কিছু বলিবার দরকার নাই। তবে, আমাদের ক্রন্দন ব্যর্থ হইতেছে না। এই যে মানুষের ব্যথিত মনের অভিশাপ, ইহা অন্তরে অন্তরে তোমাদিগকে পিষিয়া মারিতেছে। তোমাদের বিবেককে, মনুষ্যত্বকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে। এই গুলির সমস্ত গুলিই তোমাদেরই হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়া তোমাদিগকে পচাইয়া মারিবে। আমরা জাগিতেছি – আমরা বাঁচিতেছি, – তোমরা মরিতেছ, তোমরাই ধ্বংসের পথে চলিয়াছ!

'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!'

স্বাধীনতা হারাইয়া আমরা যখন আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িলাম এবং আকাশমুখো হইয়া কোন্ অজানা পাষাণ-দেবতাকে লক্ষ করিয়া কেবলই কান্না জুড়িয়া দিলাম, তখন কবির কণ্ঠে আশার বাণী দৈব-বাণীর মতোই দিকে দিকে বিঘোষিত হইল, 'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'!' বাস্তবিক আজ আমরা অধীন হইয়াছি বলিয়া চিরকালই যে অধীন হইয়া থাকিব, এরূপ কোনো কথা নাই। কাহাকেও কেহ কখনও চিরদিন অধীন করিয়া রাখিতে পারে নাই, কারণ ইহা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কেহ কখনও জয়ী হইতে পারে না। আজ যাহারা স্বাধীন হইয়া নিজের অধীনতার কথা ভুলিয়া অন্যকেও আবার অধীনতার জাঁতায় পিষ্ট করিতেছে, তাহারাও চিরকাল স্বাধীন ছিল না। শক্তি লাভ করিয়া যাহারা শক্তির এমন অপব্যবহার করিতেছে, কে জানে প্রকৃতি তাহাদের এই অপরাধের পরিণাম কত নির্মম হইয়া লিখিয়া রাখিয়াছে! 'এয়সা দিন নেহি রহেগা', চিরদিন কারুর সমান যায় না। আজ যে কপর্দকহীন ফকির, কাল তাহার পক্ষে বাদশাহ্ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। অত্যাচারীকে অত্যাচারের প্রতিফল ভোগ করিতেই হইবে। আজ আমি যাহার উপর প্রভুত্ব

করিয়া তাহার প্রকৃতি-দত্ত স্বাধীনতা, মনুষ্যত্ব ও সম্মানকে হনন করিতেছি, কাল যে সে-ই আমারই মাথায় পদাঘাত করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? শক্তি সম্পদের ন্যায্য ব্যবহারেই বৃদ্ধি, অন্যায় অপচয়ে তাহার লয়।

অন্যকে কষ্ট দিয়ে তাহার ‘আহা-দিল’ নিতে নাই, বেদনাতুরের আন্তরিক প্রার্থনায় আল্লার আরশ টলিয়া যায়। শক্তির অপব্যবহারের জন্য রোম-সাম্রাজ্য গেল, জার্মানির মতো মহাশক্তিরও পরাজয় হইল। কত উত্থান, কত পতন এই ভারত দেখিয়াছে, দেখিতেছে এবং দেখিবে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিবেক সর্বদাই মানবের পশুশক্তিকে সতর্ক করিতেছে। বিবেকের ক্ষমতা অসীম। যাহারা পশুশক্তির ব্যবহার করিয়া বাহিরে এত দুর্বার দুর্জয়, অন্তরে তাহারা বিবেকের দংশনে তেমনই ক্ষত-বিক্ষত, অতি দীন। তাহারা তাহাদের অন্তরের নীচতায় নিজেই মরিয়া যাইতেছে, শুধু লোক-লজ্জায় তাহাকে দাম্ভিকতার মুখোশ পরাইয়া রাখিয়াছে। সিংহের চামড়ার মধ্য হইতে লুকানো গর্দভ-মূর্তি বাহির হইয়া পড়িবেই। নীল শৃগালের ধূর্তামি বেশি দিন টিকিবে না। তাই বলিতেছিলাম, বাহিরের স্বাধীনতা গিয়াছে বলিয়া অন্তরের স্বাধীনতাকেও আমরা যেন বিসর্জন না দিই। আজ যখন সমস্ত বিশ্ব মুক্তির জন্য, শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য উন্মাদের মতো সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, স্বাধীনতা-যজ্ঞের হোমানলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে আসিয়া নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়াইয়া দিতেছে, তাহাদের মুখে শুধু এক বুলি, ‘মুক্তি-মুক্তি-মুক্তি’। হস্তে তাহাদের মুক্তির নিশান – মুখে তাহাদের মুক্তির বিষাণ, শিয়রে তাহাদের মুক্তির তৃপ্তি-ভরা মহা-গৌরবময় মৃত্যু। – তখনও মুক্তির সেই যুগান্তরের নবযুগেও, আমরা কিনা পলে পলে দাসত্বের, মনুষ্যত্বহীন আত্মসম্মানশূন্য ঘৃণ্য কাপুরুষের মতো অধোদিকেই গড়াইয়া চলিতেছি! এতদূর নীচ হইয়া গিয়াছি আমরা যে, কেহ এই কথা বলিলে উল্টো আবার কোমর বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিই। আমাদের এই তর্কের সবচেয়ে সাধারণ সূত্র হইতেছে, দাসত্ব – গোলামি ছাড়িয়া দিলে খাইব কী করিয়া? কী নীচ প্রশ্ন! যেন আমাদের শুধু কুকুর-বিড়ালের মতো উদর-পূর্তির জন্যই জন্ম! এমন নীচ অন্তঃকরণ লইয়া যাহারা বেহায়ার মতো বেহুদা তর্ক করিতে আসে, তাহাদের উপর খোদার বজ্র কেন যে ভাঙিয়া পড়ে না, তাহা বলিতে পারি না! আজ সারা বিশ্ব যখন ও-রকম মরার মতো বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরিয়া মুক্তিলাভের জন্য প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে, তখনও আমাদের এইরকম হৃদয়হীনতার, গোলামি মনের পরিচয় দিতে এতটুকু লজ্জা হয় না! বড়োই দুঃখে তাই বলিতে হয়, ‘এ অভাগা দেশের বুকে বজ্র হানো প্রভু, যদ্দিনে না ভাঙছে মোহ-ভার।’ আমাদের এই মোহ-ভার ভাঙিবে কে? এ-শৃঙ্খল মোচন করিবে কে? আছে, উত্তর আছে, এবং তাহা, ‘আমরাই!’ নির্বোধ মেষযূথের মতো এক স্থানে জড়ো হইয়া শুধু মাথাটা লুকাইয়া থাকিলে নেকড়ে বাঘের হিংস্র আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইব না, তাহা হইলে আমাদের ওই নেকড়ে বাঘের মতো করিয়া কান ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিবে।

দেশের পক্ষ হইতে আহ্বান আসিতেছে, কিন্তু কাজে আমরা কেহই সাড়া দিতে পারিতেছি না। অনেকে আবার বলেন যে, অন্যে কে কী করিতেছে আগে দেখাও, তার পর আমাদিগকে বলিয়ো। এই প্রশ্ন ফাঁকিবাজের প্রশ্ন। দেশমাতা সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, যাহার বিবেক আছে, কর্তব্য জ্ঞান আছে, মনুষ্যত্ব আছে, সে-ই বুক বাড়াইয়া আগাইয়া যাইবে। তোমার কী নিজের ব্যক্তিত্ব নাই যে, কে কী করিল আগে দেখিয়া তবে তুমি তার পিছু পিছু পোঁ ধরিবে? নেতা কে? বিবেকই তো তোমার নেতা, কর্তব্য-জ্ঞানই তো তোমার নেতা! দেশনায়ক যাঁহারা, তাঁহারা তো তোমার নেতা, তোমার বিবেকেরই প্রতিধ্বনি করেন। কর্তব্য-জ্ঞানের কাছে, ত্যাগের কাছে সম্ভব-অসম্ভব কিছুই নাই। সুতরাং ‘উহা সম্ভব, ইহা অসম্ভব’ বলিয়া, ছেলেমানুষি করাও আর এক বোকামি। যাহা সম্ভব তাহা করিবার জন্য তোমার ডাক পড়িতি কী জন্য? অসম্ভব বলিয়াই তো দেশ তোমার বলিদান চাহিয়াছে।

স্বার্থের গণ্ডি না পারাইয়া ভিক্ষা দেওয়া যায়, ত্যাগ বা বলিদান দেওয়া যায় না। তোমার যতটুকু শক্তি আছে প্রয়োগ করো, দেশের কাছে, খোদার কাছে অসংকোচে দাঁড়াইবার পাথেয় সঞ্চয় করো, তোমার বিবেকের কাছে তুমি অগাধ শান্তি পাইবে! ইহাই তোমার পুরস্কার। অন্যে জাহান্নামে যাইবে বলিয়া কী তুমিও তার পিছু-পিছু সেখানে যাইবে?

আজ আমাদের শুধু ক্লান্তি, – শুধু শ্রান্তি কেন? ‘এমন করে কদ্দিন খাবি’ না গোলেমালে যদ্দিন যায় করে আর কতদিন চলিবে? আমরা আমাদের দেশের জন্য, মুক্তির জন্য কি দুঃখদৈন্যকে বরণ করিয়া লইতে পারিব না? ত্যাগ, বিসর্জন, উৎসর্গ, বলিদান ছাড়া কি কখনও কোনো দেশ উদ্ধার হইয়াছে, না হইতে পারে? স্বার্থত্যাগ করিতে হইলে দুঃখকষ্ট সহ্য করিতেই হইবে, ত্যাগ কখনও আরাম-কেদারায় শুইয়া হয় না। কিন্তু ওই দুঃখকষ্ট, ইহা তো বাহিরে; একটা সত্য মহান পবিত্র কার্য করিতে গেলে যে আত্মতৃপ্তি অনুভব করা যায়, অন্তরে যে-ভাস্বর স্নিগ্ধ দীপ্তির উদয় হইয়া সকল দেহমন আলোয় আলোকময় করিয়া দেয়, সারা দেশের ভাইদের বোনদের যে প্রশংসাভরা স্নেহকল্যাণময় অশ্রুকাতর দৃষ্টি ও সারা মুক্ত বিশ্বে সাবাসি পাওয়া যায়, তাহা এই বাহিরের দুঃখকষ্টকে কী ঢাকিয়া দিতে পারে না? কার মূল্য বেশি? বাহিরের এই নগণ্য দুঃখকষ্টের, না অন্তরের স্বর্গীয় তৃপ্তির? তুমি কী চাও? – কুকুর-বিড়ালের মতো ঘৃণ্য-মরা মরিতে, না মানুষের মতো মরিয়া অমর হইতে? তুমি কী চাও? – শৃঙ্খল, না স্বাধীনতা? তুমি কী চাও? – তোমাকে লোকে মানুষের মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করুক, না পা-চাটা কুকুরের মতো মুখে লাথি মারুক? তুমি কী চাও? – উষ্ণীষ-মস্তকে উন্নত-শীর্ষ হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া পুরুষের মতো গৌরব-দৃষ্টিতে অসংকোচে তাকাইতে, না নাঙ্গা শিরে প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া কুব্জপৃষ্ঠে গোলামের মতো অবনত হইয়া হুজুরির মতলবে শরমে চক্ষু নত করিয়া থাকিতে? যদি এই শেষের দিকটাই তোমার লক্ষ্য হয়, তবে তুমি জাহান্নামে যাও! তোমার সারমেয়গোষ্ঠী লইয়া খাও দাও আর পা চাটো! আর যাহারা ত্যাগকে বরণ করিয়া লইতে পারিবে, যাহার ঘরে মুখ মলিন দেখিয়া গলিয়া যাইবে না, যাহাদের জান দিবার মতো গোর্দা আছে, আঘাত সহিবার মতো বুকের পাটা আছে, তাহারা বাহির হইয়া আইস! দেশমাতার দক্ষিণ হস্ত, আর কল্যাণ-মন্ত্রপূত অশ্রু-পুষ্প তোমাদেরই মাথায় ঝরিয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমরা চাই লাঞ্ছনার চন্দনে আমাদের উলঙ্গ-অঙ্গ অনুলিপ্ত করিতে। কল্যাণের মৃত্যুঞ্জয় কবচ আমাদের বাহুতে উষ্ণীষে বাঁধা, ভয় কী? মনে পড়ে, সেদিন দেশমাতার আহ্বান নিয়া মাতা সরলাদেবী বাঙালার কন্যারূপে পাঞ্জাব হইতে সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিলেন। কে কে সাড়া দিলে এ-জাগ্রত মহা-আহ্বানে? এমন ডাকেও যদি সাড়া না দাও,তবে জানিব তোমরা মরিয়াছ। বৃথাই এ-আহ্বান এ-ক্রন্দন তোমার, মা! যদি পার, সঞ্জীবনী সুধা লইয়া আইসো তোমার এ মরা সন্তান বাঁচাইতে। যদি তাহা না পার, তবে ইহাদিগকে ধুতুরার বীজ খাওয়াইয়া পাগলা করিয়া দাও। ইহাতে তাহারা ‘মানুষের মতো’ জাগিবে না, কিন্তু তবু জাগিবে! জানি, কুপুত্র অনেকে হয়, কুমাতা কখনও নয়, কিন্তু আর এমন করিয়া স্নেহের প্রশ্রয় দিলে চলিবে না, মা, এখন তোমাকে কুমাতা হইতে হইবে, তোমাকেই আঘাত দিয়া আমাদের জাগাইতে হইবে। আমরা পরের আঘাত চোখ বুজিয়া সহ্য করি কিন্তু স্বজনের আঘাত সইতে পারি না। তাই আর শুধু ডাকাডাকিতে কোনো ফল হইবে না। তোমার রুদ্রমূর্তি দিকে দিকে প্রকটিত হউক। যদিই এই রুদ্র ভীষণতার মধ্যে রণ-চণ্ডীর মহামারির মধ্যে, আমাদের মনুষ্যত্ব জাগে, যদি আঘাত খাইয়া খাইয়া অপমানিত হইয়া আবার আমরা জাগি, তাই আবার বলিতেছি, তোমরাও সাথে সাথে বলো,

গেছে দেশ দুঃখ নাই,

আবার তোরা মানুষ হ!

ছুতমার্গ

একবার এক ব্যঙ্গ-চিত্রে দেখিয়াছিলাম, ডাক্তারবাবু রোগীর টিকি-মূলে স্টেথিস্কোপ বসাইয়া জোর গ্রাম্ভারি চালে রোগ নির্ণয় করিতেছেন! আমাদের রাজনীতির দণ্ডমুণ্ড হর্তা-কর্তা-বিধাতার দলও আমাদের হিন্দু-মুসলমানের প্রাণের মিল না হওয়ার কারণ ধরিতে গিয়া ঠিক ওই ডাক্তারবাবুর মতোই ভুল করিতেছেন। আদত স্পন্দন যেখান যেখান হইতে প্রাণের গতি-রাগ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানে স্টেথিস্কোপ না লাগাইয়া টিকি-মূলে যদি ব্যামো নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তাহা যেমন হাস্যাস্পদ ও ব্যর্থ, রাজনীতির দিক দিয়া হিন্দু-মুসলমানের প্রাণের মিলনের চেষ্টা করাও তেমনই হাস্যস্পদ ও ব্যর্থ। সত্যিকার মিলন আর স্বার্থের মিলনে আশমান জমিন তফাত। প্রাণে প্রাণে পরিচয় হইয়া যখন দুইটি প্রাণ মানুষের গড়া সমস্ত বাজে বন্ধনের ভয়-ভীতি দূরে সরাইয়া সহজ সংকোচে মিশিতে পারে, তখনই সে মিলন সত্যিকার হয়; আর যে মিলন সত্যিকার, তাহাই চিরস্থায়ী, চিরন্তন। কোনো একটা বিশেষ কার্য উদ্ধারের জন্য চির-পোষিত মনোমালিন্যটাকে আড়াল করিয়া বাহিরে প্রাণভরা বন্ধুত্বের ভান করিলে সে-বন্ধুত্ব স্থায়ী তো হইবেই না, উপরন্তু সে-স্বার্থও সিদ্ধ না হইতে পারে, কেননা মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া কখনও কোনো কার্যে পূর্ণ সাফল্যলাভ হয় না।

এখন কথা হইতেছে, আদত রোগ কোথায়? আমাদের গভীর বিশ্বাস যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই ছোঁয়া-ছুঁয়রি জঘন্য ব্যাপারটাই। ইহা যে কোনো ধর্মেরই অঙ্গ হইতে পারে না, তাহা কোনো ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলেও আমরা জোর করিয়াই বলতে পারি। কেননা একটা ধর্ম কখনও এত সংকীর্ণ অনুদার হইতেই পারে না। ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। এইখানেই বুঝা যায় যে, কোনো ধর্ম শুধু কোনো এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তাহা বিশ্বের। আর এই ছুতমার্গ যখন ধর্মের অঙ্গ নয়, তখনই নিশ্চয়ই ইহা মানুষের সৃষ্টি বা খোদার [উপর] খোদকারি। মানুষের সৃষ্টি-শৃঙ্খলা বা সমাজ-বন্ধন সাময়িক সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা তো শাশ্বত সত্য হইতে পারে না। এই জন্যই ‘সম্ভবামি যুগে যুগে’ রূপ মহাবাণীর উৎপত্তি। আমাদেরও হাদিসে সেই জন্য প্রতি শতবর্ষে একজন করিয়া ‘মুজাদ্দিদ’ বা সংস্কারক আসেন বলিয়া লিখিত আছে। ‘বেদাৎ’ বা মানুষের সৃষ্ট রাজনীতির সংস্কার করাই এই সংস্কারকদের মহান লক্ষ্য।

হিন্দুধর্মের মধ্যে এই ছুতমার্গরূপ কুষ্ঠরোগ যে কখন প্রবেশ করিল তাহা জানি না, কিন্তু ইহা যে আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃদের মতো একটা বিরাট জাতির অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া একেবারে নিবীর্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আমরা ভাইয়ের অধিকারের জোরে জোর করিয়া বলিতে পারি। আমরা যে তাঁহাদের সমস্ত সামাজিক শাসনবিধি একদিনেই উলটাইয়া ফেলিতে বলিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু যে সত্য হয়তো একদিন সামাজিক শাসনের জন্যেই শৃঙ্খলিত হইয়াছিল, তাহার কী আর মুক্তি হইবে না? বাংলার মহাপ্রাণ মহাতেজস্বী, পুত্র, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ভারতে যেদিন হইতে এই ‘ম্লেচ্ছ’ শব্দটার উৎপত্তি সেদিন হইতেই ভারতের পতন, মুসলমান আগমনে নয়! মানুষকে এত ঘৃণা করিতে শিখায় যে ধর্ম, তাহা আর যাহাই হউক ধর্ম নয়, ইহা আমরা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারি। এই ধর্মেই নর-কে নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কী উদার সুন্দর কথা! মানুষের প্রতি কী মহান পবিত্র পূজা! আবার সেই ধর্মেরই সমাজে মানুষকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য মনে করিবার মতো হেয় জঘন্য এই ছুতমার্গ বিধি! কী ভীষণ অসামঞ্জস্য! আমাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দহনপূত কালাপাহাড়ের দলকে সেই জন্য

আমরা আজ প্রাণ হইতে আবাহন করিতেছি, এই মান্ধাতার আমলের বিশ্রী বিধি-বন্ধন ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতে, 'আয়রে নবীন, আয়রে আমার কাঁচা! আমরা যে ধর্মটাকেই একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহিতেছি, ইহা মনে করিলে আমাদের ভুল বুঝা হইবে। আমরা অন্তর হইতেই বলিতেছি যে, আমাদিগকে সীমার মাঝে থাকিয়াই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। নিজের ধর্মকে মানিয়া লইয়া সকলকে প্রাণ হইতে দু-বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি অর্জন করিতে হইবে। যিনি সত্যিকারভাবে স্বধর্মে নিষ্ঠ, তাঁহার এই উদার বিশ্বপ্রেম আপনা হইতেই আসে। যত ছোঁয়া-ছুঁয়রি নীচ ব্যবহার ভণ্ড বক-ধার্মিক আর বিড়ালী-তপস্বী দলের মধ্যেই। ইহাদের এই মিথ্যা মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়া ইহাদের অন্তরের বীভৎস নগ্নতা সমাজের চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে হইবে। এইখানে একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। একদিন আমরা এক ট্রেনে গিয়া উঠিলাম। আমাদের কামরায় মালা-চন্দনধারী অনেকগুলি হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন। আমরা কামরায় প্রবেশ করিবামাত্র অর্থাৎ আমাদের মাথায় টুপি ও পগ্‌গ দেখিয়াই ছোঁয়া যাইবার ভয়ে তাঁহারা তটস্থ হইয়া অন্য দিকে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই বেঞ্চেরই এক প্রান্তে বসিয়া এক পণ্ডিতজি বেদ ও ওইরূপ কোনো শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া ওই ভদ্রলোকদের শুনাইতেছিলেন। তিনি আমাদের দেখিয়াই এবং আমাদের অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া হাসিয়া আমাদের হাত ধরিয়া সাদরে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। ভদ্রলোকদের চক্ষু ততক্ষণে কাণ্ড দেখিয়া চড়ক গাছ। আমরাও তখন সহজ হইয়া পণ্ডিতজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি পণ্ডিত ও আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলতিলক হইয়াও কী করিয়া আমাদিগকে এমন করিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন, অথচ এই ভদ্রলোকগণ আমাদিগকে দেখিয়া কেন একেবারে দশ হাত লাফাইয়া উঠিলেন? ইহাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, আমি হিন্দু ধর্মকে ভালোবাসি ও সত্য বলিয়া জানি বলিয়া বিশ্বের সকলকে, সকল ধর্মকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি। আমার নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আছে বলিয়াই অন্য সকলকে বিশ্বাস করিবার ও প্রাণ দিয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি আমার আছে। যাহারা অন্য ধর্মকে ও অন্য মানুষকে ঘৃণা করে বা নীচ ভাবে, তাহারা নিজেই অন্তরে নীচ, তাহাদের নিজেরও কোনো ধর্ম নাই। তবে ধর্মের যে ঘটাটা দেখ, তাহা অন্তরের দীনতা-হীনতা ঢাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র!" ইহা বানানো গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

মানুষ হইয়া মানুষকে কুকুর-বিড়ালের মতো এত ঘৃণা করা – মনুষ্যত্বের ও আত্মার অবমাননা করা নয় কি? আত্মাকে ঘৃণা করা আর পরমাত্মাকে ঘৃণা করা একই কথা। সেদিন নারায়ণের পূজারি বলিয়াছিলেন, "ভাই, তোমার সে পরম দিশারি তো হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, – সে যে মানুষ!" কী সুন্দর বুকভরা বাণী! এ যে নিখিল কণ্ঠের সত্য-বাণীর মূর্ত প্রতিধ্বনি! যাঁহার অন্তর হইতে এই উদ্‌বোধন-বাণী নির্গত হইয়া বিশ্বের পিষ্ট ঘৃণাহত ব্যথিতদের রক্তে রক্তে পরম শান্তির সুধা-ধারা ছড়াইয়া দেয়, তিনি মহা-ঋষি, তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার! যদি সত্যিকার মিলন আনিতে চাও ভাই, তবে ডাকো – ডাকো, এমনি করিয়া প্রাণের ডাক ডাকো। দেখিবে দিকে দিকে অবহেলিত জনসংঘ তোমার এই জাগ্রত মহা-আহ্বানে বিপুল সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিবে। যাহারা স্বার্থপর, তাহারা মাথা কুটিয়া মরিলেও তো প্রাণের সাড়া কোথাও পাইবে না, যাহাকে পাইয়া তাহারা উল্লাসে নৃত্য করিবে তাহা বাহিরের লৌকিক 'ডিটো' দিয়া মাত্র। অন্তরের ডাক মহা ডাক। ডাকিতে হইলে প্রথমে বেদনায় – একেবারে প্রাণের আর্ত তারে গিয়া এমনই করিয়া ছোঁয়া দিতে হইবে। আর তবেই ভারতে আবার নূতন সৃষ্টি জাগিয়া উঠিবে।

হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমাহারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া – মানব! তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! বলো দেখি, 'আমার মানুষ ধর্ম!' দেখিবে, দশদিকে সার্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া

উঠিতেছে। এই উপেক্ষিত জনসংঘকে বুক দাও দেখি, দেখিবে এই স্নেহের ঈষৎ পরশ পাওয়ার গৌরবে তাহাদের মাঝে ত্যাগের একটা কী বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগে! এই অভিমানীদিগকে বুক দিয়া ভাই বলিয়া পাশে দাঁড় করাইতে পারিলেই ভারতে মহাজাতির সৃষ্টি হইবে, নতুবা নয়। মানবতার এই মহা-যুগে একবার গণ্ডি কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলো যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ – তুমি সত্য।

মহাত্মা গান্ধিজি ধরিয়াছেন এই মহা সত্যকে, তাই আজ বিক্ষুব্ধ জনসংঘ তাঁহাকে ঘিরিয়া এমন আনন্দের নাচ নাচিতেচে। তোমরা রাজনীতিক যুক্তি-তর্কের চটক দেখাইয়া লেখাপড়া-শেখা ভণ্ডদের মুগ্ধ করিতে পার, কিন্তু এমন ডাকটি আর ডাকিতে পারিবে না। আমরা বলি কী, সর্বপ্রথম আমাদের মধ্য হইতে এই ছুতমার্গটাকে দূর করো দেখি, দেখিবে তোমার সকল সাধনা একদিন সফলতার পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। হিন্দু মুসলমানকে ছুঁইলে তাঁহাকে স্নান করিতে হইবে, মুসলমান তাঁহার খাবার ছুঁইয়া দিলে তাহা তখনই অপবিত্র হইয়া যাইবে, তাঁহার ঘরের যেখানে মুসলমান গিয়া পা দিবে সে-স্থান গোবর দিয়া (!) পবিত্র করিতে হইবে, তিনি যে আসনে বসিয়া হুঁকা খাইতেছেন মুসলমান সে আসন ছুঁইলে তখনই হুঁকার জলটা ফেলিয়া দিতে হইবে, – মনুষ্যত্বের কী বিপুল অবমাননা! হিংসা, দ্বেষ, জাতিগত রেষারেষির কী সাংঘাতিক বীজ রোপণ করিতেছ তোমরা! অথচ মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিতেছ, ‘ভাই মুসলমান এসো, ভাই ভাই এই ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই!’ কী ভীষণ প্রতারণা! মিথ্যার কী বিশ্রী মোহজাল! এই দিয়া তুমি একটা অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে? শুনিয়া শুধু হাসি পায়। এসো, যদি পার, তোমার স্বধর্মে প্রাণ হইতে নিষ্ঠা রাখিয়া আকাশের মতো উদার অসীম প্রাণ লইয়া এসো। এসো তোমার সমস্ত সামাজিক বাধাবিঘ্ন দু-পায় দলিয়া মানুষের মতো উচ্চ শিরে তোমার মুক্তবিথার নাঙ্গা মনুষ্যত্ব লইয়া। এসো, মানুষের বিরাট বিপুল বক্ষ লইয়া। সে-মহা আহ্বানে দেখিবে আমরা হিন্দু-মুসলমান ভুলিয়া যাইব। আমাদের এই তরুণের দল লইয়া আমরা আজ কালাপাহাড়ের দল সৃষ্টি করিব। আমরাই ভারতে আবার অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিব। যে রক্ষণশীল বৃদ্ধ এতটুকু ‘টু’ করিবে, তাহার গর্দান ধরিয়া এই মুক্তির দিনে বাহির করিয়া দাও। যে আমাদের পথে দাঁড়াইবে তাহার টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফেলো। শুধু মানুষ বাঁচিয়া থাকো, ভাই, – ভারতে শুধু চিরকিশোর মানুষেরই জয় হউক!

জাগরণী

বকুল! জা-গো! জাগো বকুল, এই পল্লিমাঠের পথের পাশে মেঠো গানের সহজ সুরে জাগো। জাগো তারই রেশের ছোঁয়ায়! জাগো বেদন নিয়ে, পল্লিশিশুর মুক্ত-বিথার প্রাণ নিয়ে, পল্লিতরুণের তাজা খুনের তীব্র কাঁপুনি নিয়ে। জাগো – জাগো বকুল, জাগো! শরম-রাঙা পাপড়িকটি তোমার খুলে দাও – ছড়িয়ে দাও এই নবীন আষাঢ়ের কালো মেঘের জোলো ঝাপটায়। সংকুচিতা, ভীতা, ত্রস্তা বকুল! ছোট্ট বকুল! জাগো! জাগো – পরাগ-মাখা পবিত্র তোমার ধৌত-করুণ চাউনি নিয়ে, – এই বাদর-রাগিণী-আহত বাদল-প্রাতে। তোমার পরিমলের উদাস সুরভি নিয়ে এসে আমেজ দাও রাজার যত গুল-ভরা বাগিচায়। অনাদৃতা তুমি, তাই বলে তোমার ওই এক নিশ্বাসের সুরভিটুকু নিয়ে গর্বিতার মতো এসো না। এসো তুমি আধ-মুকুলিত-যৌবনা নববধূর মতো ধীর-মন্থর চরণে – পায়ের মুখর পায়জোর সামলে! লাজ-জড়িমা-জড়তি তোমার বুক ভরে থাকে যেন পূত শালীনতার সংযম আর প্রশান্ত প্রীতির স্নিগ্ধ-শান্তি! জাগো বকুল, জাগো! তুমি যেখানে ফোটো, সেই পল্লিতেই আছে আমাদের সত্যিকার বাংলা, – বাঙালির আসল প্রাণ।

আমাদের এই শাশ্বত বাঙালির সুষুপ্ত, ঘুমে-ভরা অলস-প্রাণ জাগিয়ে তোলো তোমার

জাগরণের সোনার কাঠি দিয়ে! তাদের ফুলের প্রাণে দাগ বসিয়ে দিয়ো তোমার মদির বাসের উন্মাদনার ছুরি হেনে! জাগো বকুল, জাগো! ওই রাজবাগানের ফুলবালাদের সালাম করো, আর তোমার অশ্রু-ভরা অভিনন্দন জানাও। ছোট্ট তুমি, এই পল্লি-বাটের পায়ে-চলার-পথ থেকে তাগিদে তোমার বুকভরা ভক্তি-ভালোবাসা নিবেদন করো। তোমার ওই পরাগালক্ত নিবেদিত অর্ঘ্য নিয়ে সে গুলবাহার-ভরা সুন্দরীদের বলো, – "ওগো, আমি ছোট্ট বকুল – নেহাত ছোট্ট! আমি জেগেছি! তাও সে অনেক দূরে পল্লির অচিন পথে! তোমরা আমায় ঘৃণা কোরো না! আমি আনব শুধু আমার পল্লিদুলালদের বুকের বেদন, তাদের খাপছাড়া আকুল আবদার, আর যুগ যুগ ধরে – পিষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণের ব্যথা বিজড়িত সহজ চিন্তার স্মৃতি। এ বাছাদেরও ঘৃণা কোরো না, অবহেলা এদের প্রাণে বড্ড বাজবে! শিশু এরা – কুঁড়ি এরা, এখনও ফোটেনি। এরা তোমাদের দেশের হাওয়ার উড়িয়ে দেওয়া রেণুকা।

দিয়ো গো দিয়ো, তোমাদের ওই রানির স্নেহের শুধু একটু রেণু, উড়িয়ে দিয়ো দখিন বায়ে এদের পানে! আহা, অনাদৃত বিড়ম্বিত হতভাগা, এরা, ঘৃণা কোরো না এদের।"... জাগো বকুল, জাগো! ঝোড়ো হাওয়ায় আর জোলো মেঘে তোমায় ডাক দিয়েছে। জাগো – জাগো, পল্লিবুকের বেদন নিয়ে, পল্লিশিশুর ঝরণা-হাসি নিয়ে, আর তরুণদের সবুজ বুকের অরুণ খুনের উষ্ণগতি নিয়ে! জাগো, বকুল জাগো!! জাগো যৌবনের জয়টিকা নিয়ে!!!

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় (ন্যাশনাল) বিদ্যালয় লইয়া একটু খোঁচা দিয়াছি, তাহা অন্য কোনো ভাব-প্রণোদিত হইয়া নয়। জাতীয় জিনিস লইয়া জাতির প্রত্যেকেরই ভালো-মন্দ বিচার করিয়া দেখিবার অধিকার আছে। তাহা ছাড়া, 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ', ভুল সকলেরই হয়; নিজের ভুল নিজে দেখিতে পায় না। অতএব আমাদেরই জাতীয় বিদ্যালয়রে যে ভুল আমাদের চোখে পড়িবে, তাহা আমাদেরই শোধরাইয়া লইতে হইবে। প্রথম কোনো বড়ো কাজ করিতে গেলে অনেক রকম ভ্রম-প্রমাদ হওয়া স্বাভাবিক জানি, এবং তাহাকে ক্ষমা করিতেও পারা যায় – যদি জানি যে তাঁহারা জানিয়া ভুল করিতেছেন না। কিন্তু যদি দেখি যে, এই সব হোমযজ্ঞের হোতারা জানিয়া শুনিয়া ভুল করিতেছেন বা জাতীয় শিক্ষা-রূপ পবিত্র জিনিসের নামেই নিজ-নিজ স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজিতেছেন, তাহা হইলে হাজার অপ্রিয় হইলেও আমাদিগকে তাহা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। পবিত্র কোনো জিনিসে কীট প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকাও অপরাধ। এই জাতীয় বিদ্যালয়ে কাঁচা কাঁচা অধ্যাপক নিয়োগ লইয়া যে ব্যাপার চলিতেছে, তাহা হাজার চেষ্টা করিলেও চাপা দেওয়া যাইবে না; 'মাছ দিয়া শাক ঢাকা যায় না'। কাঁচা অধ্যাপক মানে বয়সে কাঁচা নয়, বিদ্যায় কাঁচা। আমাদের আর সবই ভালো, কেবল বে-বন্দোবস্তই হইতেছে 'গুণরাশিনাশী।' গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতন তদুপরি আবার আমাদের একগুঁয়েমিও আছে। দোষ করিতেছি জানিয়া শুনিয়াও তাহা শুধরাইব না। যাঁহারা দেশের মঙ্গলের জন্য সকল স্বার্থ বলিদান দিয়া গোলামখানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন মনে করিয়াছিলাম, আজ যদি কর্মগতিকে দেখিতে পাই বা বুঝিতে পারি যে, তাঁহারা অন্য এক স্বার্থের লোভে বা বেশি লাভের সম্ভাবনায় ওরকম লোকদেখানো ত্যাগ দেখাইয়াছেন, তাহা হইলে বড়ো কষ্ট বোধ হয়। এখন কিন্তু অনেকেরই কার্য দেখিয়া সেই রকম বোধ হইতেছে। যে সব অধ্যাপক গোলামখানা ছাড়িয়া আমাদের বাহবা লইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই যে জাতীয় বিদ্যালয়রে অধ্যাপক করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। কেননা তাঁহারা কখনও এই ত্যাগের বদলে আর একটা বড়োরকম লাভের আশায় এ ত্যাগ দেখান নাই। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আরও অনেকে লাফাইয়া

উঠিয়া এইরকম মিথ্যা ভণ্ডামির ত্যাগ দেখাইতে ছুটিতে পারে। কেননা, ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি তো হইলই না, উলটো দেশময় একটা বাহবা পড়িয়া গেল যে, অমুক লোকটা একেবারে ত্যাগের চূড়ান্ত করিয়াছে – একেবারে বুদ্ধদেব! কিন্তু এ মিথ্যাকে আর যেই প্রশ্রয় দেন, আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না। মঙ্গল উৎসবে মিথ্যার অমঙ্গল কিছুতে প্রবেশ করিতে দিব না। আমরা অন্তর হইতে বলিতেছি, সত্যকে এড়াইয়া চলিয়ো না, ইচ্ছা করিয়া বা স্বার্থান্ধ হইয়া এমন মহৎ অনাবিল অনবদ্য জিনিসকে পঙ্কিল-কলঙ্কিত করিয়ো না, – যদি বুঝি তুমি বুঝিবার দোষে তাহা করিতেছ, ভণ্ডামি করিতেছ না, তবে তোমায় প্রাণ হইতে দেশবাসী ক্ষমা করিবে, স্নেহের দাবি লইয়া তোমার ভুল শুধরাইয়া দিবে, এবং তোমার গায়ে কাঁটাটি ফুটিতে দিবে না। যে সত্যিকার ত্যাগী তাঁহার পায়ে কাঁটা ফুটিলে আমরা দাঁত দিয়া তুলিয়া দিতে রাজি আছি। দোষ রাজতন্ত্রের নয়, দোষ আমাদেরই। আমরাই নিত্য নিতুই মঙ্গলের নামে, দেশের নামে নিজের স্বার্থ বাগাইয়া তো লইতেছি। এই ভণ্ডামি আর মোনাফেকিই তো সর্বনাশের মূল। প্রথমে আমাদিগকে মানুষ হইতে হইবে, স্বার্থের মায়া ত্যাগ করিয়া সত্যকে বড়ো করিয়া দেখিতে শিখিতে হইবে, তাহার পর যেন বড়ো কাজে হাত দিই। সেবার জাতীয় বিদ্যালয় অঙ্কুরেই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল, এবারও যদি ওইরকম হয়, তাহা হইলে লজ্জায় আর মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না। যাহার সত্যিকার কর্মী, তাঁহারাও কী অসত্যের জঞ্জাল হইতে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিবেন না? মিথ্যাকে সহ্য করার মতো কাপুরুষতা আর পাপ নাই। মহান কোনো কাজে অতি প্রিয়জনের দোষ থাকিলেও তাহা লুকাইলে চলিবে না। লোকলজ্জা বা মুখচোরা জিনিসটাই আমাদিগকে এমন দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। বন্ধুর মর্যাদার চেয়ে সত্যের মর্যাদা অনেক উপরে।

তাহা ছাড়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়রে কারিকুলাম কী? স্ট্যান্ডার্ডেরই বা কোনো একটা নিয়ম-কানুন বা প্রোগ্রাম আদি আছে কি? হইবে কখন? সকলেই তো দেখি, বসিয়া বসিয়া মাছি মারিতেছেন। অথচ কাঁদুনি গাহিতেছেন, ‘ছেলে জুটিতেছে না, আবার গোলামখানায় গিয়া ঢুকিতেছে’, ইত্যাদি! কিন্তু এই সব কাণ্ড দেখিয়া কয়জন বদসাহসী ছেলে ইহাতে আসিতে পারে? ভালো করিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও তো, দেখিবে তোমায় তখন ডাকিতে হইবে না – আপনিই তোমার অঙ্গন-ভরা লক্ষ তরুণ কণ্ঠে ‘হাজির’ ‘হাজির’ রব উত্থিত হইবে। তোমার মন্ত্রে তবে সে তোমার দোষ বা ক্ষমতার অভাব, তাহা মন্ত্রের দোষ নয়। নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা বলিয়া আক্ষেপ করা – ধৃষ্টতা আর বোকামি মাত্র।

আমরা চাই, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবনশক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা। ‘মেদা-মারা’ ছেলের চেয়ে সে হিসাবে ‘ডাংপিটে’ ছেলে বরং অনেক ভালো। কারণ পূর্বোক্ত নিরীহ জীবরূপী ছেলেদের ‘জান’ থাকে না; আর যাহার জান নাই, সে-‘মোর্দা’ দিয়া কোনো কাজই হয় নাই, আর হইবেও না। এই দুই শক্তিকে – প্রাণশক্তি আর কর্মশক্তিকে একত্রীভূত করাই যেন আমাদের শিক্ষার বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়রে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। শত্তুর যেন ইহাকে গোলামখানা বা তেলাম-খানা না বলিতে পারে।

জাতীয় শিক্ষা

কথায় বলে, ‘টকের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তেঁতুলতলে বাসা।’ আজকাল ‘জাতীয় শিক্ষা’, ‘জাতীয় শিক্ষা’ বলিয়া যে বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে দেশে, ইহার প্রতিও উক্ত ব্যাঙ্গোক্তি দিব্যি খাটে! সরকারি বিদ্যালয়ে বিদ্যা লয় হয় বলিয়াই যদি আমরা

তাহাকে তালাক দিই , তাহা হইলে আমরা আমাদের শিক্ষার পরিপুষ্টির জন্য বা মনের মতো শিক্ষা দিবার জন্য যে বিদ্যাপীঠ খাড়া করিয়াছি বা করিব, তাহা কিছুতেই ওই সরকারি বিদ্যালয়েরই নামান্তর বা রূপান্তর হইবে না। তাহা হইলে টকের ভয়ে আমরা বৃথাই বাঁধা বাসা ফেলিয়া পলাইয়া আসিলাম, কেননা আবার আমাদের আর একরকম ‘টকবৃক্ষ’-এরই ছায়াতলে আশ্রয় লইতে হইল।

‘শুনিয়াছি, ‘বন্দেমাতরম’-এর যুগে যখন স্বদেশি জিনিসের সওদা লইয়া দেশময় একটি হইহই ব্যাপার, রইরই কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছিল, তখন অনেক দোকানদার বা ব্যবসায়ীগণ বিলাতি জিনিসের ট্রেডমার্ক বা চিহ্ন দিব্যি চাঁচিয়া-ছুলিয়া উঠাইয়া দিয়া তাহাতে একটি স্বদেশি মার্কা মারিয়া লোকের নিকট বিক্রয় করিতেন। এখন যে-পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল নব-উদ্ভাবিত জাতীয় বিদ্যালয়ে দেওয়া হইতেছে, তাহাও ঠিক ওই রকম বিলিতি শিক্ষারই ট্রেডমার্ক উঠাইয়া ‘স্বদেশি’ মার্কা লাগাইয়া দেওয়ার মতো। শিক্ষায় যা একটু মৌলিকতা দেখা যাইতেছে, তাহা কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য নয়। ওরকম এক-আধটু নূতনত্ব যে কেহ একটি নূতন জিনিসে লাগাইতে পারে। যদি আমাদের এই জাতীয় বিদ্যালয় ওই সরকারি বিদ্যাপীঠেরই দ্বিতীয় সংস্কাররূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই উহাকে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, বা গৌরবও অনুভব করিতে পারি না। যাহা আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়, যাহা অন্যের ভুল দাগে দাগা-বুলানো মাত্র, তাহাকে কী বলিয়া কোন্ লজ্জায় ‘হামারা’ বলিয়া বুক ঠুকিয়া তাহাদেরই সামনে দাঁড়াইব – যাহাদিগকে মুখ ভ্যাংচাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি আবার তাহাদেরই হুবহু ‘হনুকরণ’ করিতেছি। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষাদাতা কর্তাদের সম্বন্ধে আমরা আজ পর্যন্ত যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা খারাপ বলিতে আমাদেরই বক্ষে বাজিতেছে; কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিয়া ভণ্ডামি দিয়া কখনও মঙ্গল উৎসবের কল্যাণ-প্রদীপ জ্বলিবে না। শুধু চরকা দিয়া সুতা কাটানো ছাড়া এ ন্যাশনাল বিদ্যালয়ে তেমন কিছু নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই, যারা সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশের ছেলেদের মনের বা এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী। এসবই ইংরেজি কায়দা-কানুনকে যেন মাথায় পগ্‌গ ও পায়ে নাগরা জুতা পরাইয়া এদেশি করা; অথবা সাহেবকে ধুতি ও মেমকে শাড়ি পরাইয়া বাবু ও বিবি সাজানো গেছে। এর পূর্বে স্বদেশি যুগে যখন আর একবার এইরকম জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তখনও এই ব্যাপার ঘটিয়া সব কিছু পণ্ড হইয়া গিয়াছিল।

এসব দোষ তো আছেই, তাহা ছাড়া এমন ব্যাপার এখানে অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা কিছুতেই মার্জনা করা যায় না। যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রফেসর বা অধ্যাপক নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহার সকলেই কী নিজ নিজ পদের উপযুক্ত? কত উপযুক্ত লোককে ঠকাইয়া শুধু দুটো বক্তৃতা ঝাড়ার দরুন ইহারা অনেকেই নিজের রুটির জোগাড় করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন। আজ আমরা তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি এখনও এই রকম ব্যাপার চলিতে থাকে, তবে বাধ্য হইয়া আরও অপ্রিয় সত্যকথা আমাদিগকে বলিতে হইবে। পবিত্রতার নামে, মঙ্গলের নামে এমন জুয়াচুরিকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের ভবিষ্যৎ একদম ফরসা! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বা দেশের লোক কতকগুলি ভূতের বাথান ও আখড়া পাকাইবার জন্য বুকের রক্তসম টাকার আড়ি হুড়মুড় করিয়া ঢালিয়া দেন নাই। তাঁহারা টাকা ঢালিয়া দিয়াছেন ইংরাজি মেম-ভারতীয় জুতোপরা পায়ে নয়, বাগ্‌দেবী ভারতী-বীণাপাণির কমল পায়ে। এর চেয়ে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া ‘খোঁড়া ওজর’ দেখাইলে চলিবে না, তাঁহারা ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন কি?

ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ

আমাদের হিন্দুস্থান যেমন কীর্তির শ্মশান, বীরত্বের গোরস্থান, তেমনই আবার তাহার বুক অত্যাচারীর আততায়ীর আঘাতে ছিন্নভিন্ন। সেইসব আঘাতের কীর্তিস্তম্ভ বুকে ধরিয়া স্তম্ভিতা এই ভারতবর্ষ দুনিয়ার মুক্তবুকে দাঁড়াইয়া আজ শুধু বুক চাপড়াইতেছে। অত্যাচারীরা যুগে যুগে যত কিছু কীর্তি রাখিয়া গিয়াছে, এইখানে তাহাদের সব কিছুরই স্মৃতিস্তম্ভ আমাদের চোখে শূলের মতো বাজিতেছে। কিন্তু এই সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, যেখানে আমাদের ভাইরা নিজের বুকের রক্ত দিয়া আমাদিগকে এমন উদ্‌বুদ্ধ করিয়া গেল, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের নিহত সব হতভাগ্যেরই স্মৃতিস্তম্ভ বেদনা-শেলের মতো আমাদের সামনে জাগিয়া থাক, ইহা খুব ভালো কথা, – কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদেরই দুশমন ডায়ারকে বাদ দিলে চলিবে না। ইহার যে স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা হইবে, তাহার চূড়া হইবে এত উচ্চ যে ভারতের যে-কোনো প্রান্ত হইতে তা যেন স্পষ্ট মূর্ত হইয়া চোখের সামনে জাগিয়া ওঠে। এ-ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষ জাতিকে চিরসজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমনই জল্লাদ কশাই-এর আবির্ভাব মস্ত বড়ো মঙ্গলের কথা। ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ যেন আমাদিগকে ডায়ারের স্মৃতি ভুলিতে না দেয়। ইহার জন্য আমাদেরই সর্বাগ্রে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। নতুবা আমরা অকৃতজ্ঞতার বদনামের ভাগী হইব। এই যে আজ আমাদের নূতন করিয়া জাগরণ, এই যে আঘাত দিয়া সুপ্ত চেতনা, আত্মসম্মানকে জাগাইয়া তোলা, ইহার মূল কে? – ডায়ার।

মানুষের, জাতির, দেশের যখন চরম অবনতি হয়, তখনই এইরূপ নরপিশাচ জালিমের আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। মানুষ যখন নিজের প্রকৃতিদত্ত অধিকারের কথা ভুলিয়া যায়, শত বন্ধনের মধ্যে তাহার জীবনের গতি-চাঞ্চল্য হারাইয়া ফেলে, তখন তাহার আর মান-অপমান জ্ঞান থাকে না, প্রভুর দেওয়া দয়ার দানকে গোলামের মতো সে মহা-দান বলিয়া মাথায় তুলিয়া বরণ করিয়া লয় এবং তাহার ভৃত্য-জীবন সার্থক হইল মনে করে। তাহার মন এত ছোটো হইয়া যায়, তাহার আশা এত হেয় ও হীন হইয়া পড়ে যে, সে ভাবিতেও পারে না – যে দান মাথায় করিয়া আজ সে গৌরব অনুভব করিতেছে, যে দানকে সে শিরোপা করিয়া (অভিরুচি অনুসারে কখনও পেছনে নেজুরের মতো জুড়িয়া) মুক্ত-স্বাধীন বিশ্বের কাছে বক্ষ স্ফীত করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার দাম এক কথায় ‘পাঁচ জুতি’।

মনুষ্যত্বের অবমাননা ও লাঞ্ছনা শুধু ভিক্ষুকের জাতিই হাসিমুখে নিজেদের গৌরব বলিয়া মানিয়া লইতে পারে। অন্তরে যাহারা ঘৃণ্য নীচ আর ছোটো হইয়া গিয়াছে, আত্মসম্মান-জ্ঞান যাহাদের এত অসাড়-হিম হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিতে চাই – এই ডায়ারের দেওয়া অপমানের মতো বজ্র-বেদন।

এই ডায়ারের মতো দুর্দান্ত কশাই সেনানী যদি সেদিন আমাদিগকে এমন কুকুরের মতো করিয়া না মারিত, তাহা হইলে কী আজিকার মতো আমাদের এই হিম-নিরেট প্রাণ অভিমান-ক্ষোভে গুমরিয়া উঠিতে পারিত – না, আহত আত্মসম্মান আমাদের এমন দলিত সর্পের মতো গর্জিয়া উঠিতে পারিত? কখনই না। আজ আমাদের সত্যিকার শোচনীয় অবস্থা সাদা চোখে দেখিতে পারিয়াছি এই ডায়ারেরই জন্য। ডায়ারের প্রচণ্ড পদাঘাত, পৈশাচিক খুন-খারাবি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া আমাদের ঘৃণ্য হীন অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে। আরও জানাইয়া দিয়াছে যে, – যে নিষ্ঠীবন মাথায় করিয়া প্রভুর দেওয়া যে চাপরাশ পরিয়া, যে ছিন্ন জুতার মালা গলায় দুলাইয়া আমরা আহাম্মকের মতো দুনিয়ার স্বাধীন জাতিদের সামনে দাঁড়াইয়া – গোলামির ঝুটা গৌরব দেখাইতে গিয়া শুধু হাস্যাস্পদ হইয়াছিলাম, তাহাতে কেহ আমাদের প্রশংসা তো করেই নাই, উলটো, আরও, ‘হট্ যাও গোলাম কা জাত’ বলিয়া অবলীলাক্রমে লাঠির গুঁতো, বুটের টক্কর

লাগাইয়াছে। তাহারা স্বাধীন-আজাদ; তাহারা আমাদের এ-হীন নীচতা, এত হেয় ভীরুতা, এমন ঘৃণ্য কাপুরুষতাকে পা দিয়া মাড়াইয়া যাইবে না তো কি মাথায় তুলিয়া লইবে? অন্ধ আমরা, আমাদের অবস্থা দেখিতে পাইতেছিলাম না, – সে অন্ধত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছে এই ডায়ার! আমাদের এই নির্লজ্জ কাপুরুষতাকে ভীম পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়াছে এই জেনারেল ডায়ার! গোলামের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধ কীরকম তাহাই সে নির্মম কঠোরভাবে জানাইয়া দিয়াছে। অন্য প্রতারকদের মতো গলায় পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়া আদর দেখাইতে যায় নাই সে – সে নারীর সামনে উলঙ্গ করিয়া মেথরের হাতে বেত্র দিয়া তোমার পিঠের চামড়া তুলিয়াছে! গর্দানে পাথর চাপা দিয়া বুকের উপর হাঁটাইয়াছে, তাহাদের পায়ে তোমাদিগকে সিজ্‌দা করাইয়া ছাড়িয়াছে। – আর, তবে তোমরা জাগিতে পারিয়াছ। তোমাদিগকে জাগাইতে চাই এমনই প্রচণ্ড নির্মম কশাই-শক্তি! এত নির্মমভাবে, এমন পিশাচের মতো বেত্রাঘাত না করিলে তোমরা জাগিতে না, তোমরা মা-বোনদের সামনে উলঙ্গ করিয়া হাত-পা বাঁধিয়া পশুর মতো না পিটাইলে তোমাদের আত্মসম্মান-জ্ঞান ফিরিয়া আসিত না! ডায়ারের বুট এমন করিয়া তোমাদের কলিজা মথিত না করিয়া গেলে তোমাদের চেতনা হইত না। তোমার মুখের সামনে তোমার আত্মীয়-আত্মীয়ার মুখে এমনি করিয়া থুথু না দিলে তোমাদের মানব-শক্তি খেপিয়া উঠিত না! – তাই আজ আমরা ডায়ারকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতেছি, 'খোদা তোমার মঙ্গল করুন!' তুমি যে মঙ্গল দিয়া গিয়াছ আমাদের সারা ভারতবাসীকে, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না, আমরা নিমকহারামের জাতি নই। নিশ্চয়ই তুলিব তোমার স্মৃতিস্তম্ভ, মহৎ প্রতিহিংসারূপে নয়, প্রতিদান স্বরূপ। আজ আমাদের এ-মিলনের দিনে তোমাকে ভুলিতে তো পারব না ভাই! এই মহামানবের সাগরতীরে ভারতবাসী জাগিয়াছে – বড়ো সুন্দর মোহন মূর্তিতে জাগিয়াছে! সেই তোমার আনন্দের হত্যার দিনে, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের হতভাগ্যদের রক্তের উপর দাঁড়াইয়া হিন্দু-মুসলমান দুই ভাই গলাগলি করিয়া কাঁদিয়াছে। দুঃখের দিনেই প্রাণের মিলন সত্যিকার মিলন হয়। আজ আমাদের এ-মিলন যে স্বর্গের উপর ভিত্তি করিয়া নয় ভাই, আজ আমরা পরস্পর পরস্পরকে সমান ব্যথায় ব্যথী, একই মায়েরে পেটের ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি। কাঁদিয়াছি – গলা জড়াজড়ি করিয়া কাঁদিয়াছি। – আমাদের ভাইদের খুন-মাখানো সমাধির উপর দাঁড়াইয়া আমরা এক ভাই অন্য ভাইকে চিনিয়াছি, আর বড়ো প্রাণ ভরিয়াই গাহিয়াছি –

আমরা মিলেছি আজ মায়েরে ডাকে,

এমন ঘরের হয়ে পরের মতন

ভাই ছেয়ে ভাই কদিন থাকে!

আজ এসো ডায়ার, আমাদের এই মহামিলনের পবিত্র দৃশ্য দেখিতে তোমাকেও নিমন্ত্রণ করিতেছি। আজ ঈর্ষা-দ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছে ভাই, তোমারই জন্য আমাদের বুকের আসন পাতা রহিল।

এসো ভাই হিন্দু! এসো ভাই মুসলমান! তোমার আমার উপর অনেল দুঃখ-ক্লেশ, অনেক ব্যথা-বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে; আমাদের এ বাঞ্ছিত মিলন বড়ো দুঃখের, বড়ো কষ্টের ভাই! খোদা যখন আমাদের জাগাইয়াছেন, তখন আর যেন আমরা না ঘুমাই। যদি এতটুকু ঘুমের খোমার আসে, তবে যেন এই ডায়ারকে স্মরণ করিয়া আবার আমরা হুংকার দিয়া খাড়া হইতে পারি, ডায়ার-স্মৃতিস্তম্ভের ওই আকাশের মর্মভেদী চূড়া দেখিয়া যেন মনুষ্যত্বের শক্তির সাড়া আমাদের মাঝে গর্জন করিয়া উঠে। আমাদের এ-

মিলন যদি মিথ্যা হয়, তবে যেন আমাদিগকে সচেতন করিতে যুগে-যুগে এই ডায়ারের বজ্র বেদনার আবির্ভাব হয়। – আমাদের প্রীতি-বন্ধন অক্ষয় হোক। আমাদের এ-মহামিলন চিরন্তন হোক। আমরা আজ সব সংকীর্ণতা, অতীতের সকলদুঃখ-ক্লেশ ভুলিয়া ভাই-এর কোল বাড়াইয়া দিই। এসো ভাই, আর একবার হাত ধরাধরি করিয়া এই খোলা আকাশের মুক্ত মাঠে দাঁড়াই।

ধর্মঘট

দেশে একটা প্রবাদ আছে, 'যে এলো চষে সে রইল বসে, নাড়া-কাটাকে ভাত দাও এক থালা কষে।' হূলের দংশন-জ্বালা যথেষ্ট থাকলেও কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। স্বয়ং 'নাড়া-কাটা' প্রভুরাও এ-কথাটা ভালো করিয়াই বুঝেন, কিন্তু বুঝিয়াও যে না বুঝিবার ভান করেন বা প্রতিকারের জন্য নিজেদের দারাজ-দস্ত সামলান না, ইহা দেখিয়া বাস্তবিকই আমাদের মনুষ্যত্বে, বিবেক আঘাত লাগে এবং তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা তুলিলেই হইল 'ধর্মঘট'। চাষি সমস্ত বৎসর হাড়-ভাঙা মেহনত করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দু-বেলা পেট ভরিয়া মাড়ভাত খাইতে পায় না, হাঁটুর উপর পর্যন্ত একটা তেনা বা নেঙট ছাড়া তাহার আর ভালো কাপড় পিরান পরা সারা-জীবনেও ঘুটিয়া উঠে না, ছেলেমেয়েরে সাধ-আরমান মিটাইতে পায় না, অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনরা পায়রে উপর পা দিয়া বারোমাস তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবি চালে দিন কাটাইয়া দেন। কয়লার খনির কুলিদিগকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাদের কেহ ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের বেশি বাঁচে না; তাহারা দিবারাত্রি খনির নীচে পাতালপুরীতে আলো-বাতাস হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া কয়লার গাদায় কেরোসিনের ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করিয়া শরীর মাটি করিয়া ফেলে। কোম্পানি তো তাহাদেরই দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছেন, কিন্তু এ-হতভাগ্যদের স্বাস্থ্য, আহার প্রভৃতির দিকে ভুলিয়াও চাইবেন না। এই কুলিদিগের চেহারার দিকে তাকাইয়া কেহ কখনও চিনিতে পারিবেন না যে, ইহারা মানুষ কী প্রেত-লোক-ফেরতা বীভৎস নর-কঙ্কাল। দোষ কাহাদের? কর্তাদের মতে দোষ অবশ্য এই হতভাগাদেরই। কারণ পেট বড়ো 'মুদ্দই' এবং পেটের জন্যই ইহারা এমন করিয়া আত্মহত্যা করে।

আমরা মাত্র এই দুই-একটি নজির দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। দেশের সমস্ত কল-কারখানায়, আড়তে গুদামে 'ভাবিয়া চিন্তিয়া মানুষ হত্যার' এইরূপ শত শত বীভৎস নগ্নতা দেখিতে পাইবেন। আমাদের ক্ষমতা নাই যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিয়া বলি। যাঁহারা ওইসব কলকারখানায় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এতটুকুও সংশ্লিষ্ট আছেন, বা একদিনের জন্যও ওদিক মাড়াইয়াছেন তাঁহারাই আমাদের এই বর্ণনার চেয়ে এর সত্যতা কতগুণ বেশি বুঝিতে পারিবেন। আজকাল বিশ্ব-মানবের মধ্যে larger humanity বলিয়া যে একটা মহত্তর মানবতার স্বর্গীয় ভাব জাগিয়াছে, এই কলকারখানার অধিকাংশ কর্তা বা কর্তৃপক্ষেরই সে-দিকটা যেন একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের চোখের সামনে রাত্রিদিন মনুষ্যত্ব-বিবর্জিত কত অমানুষিক পাশবতা তাহাদেরই এইসব কারখানায় আড়তে অনুষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু তাঁহারা নির্বাক নিশ্চল! নিজেরা 'মজাসে' আকণ্ঠ ভোগের মধ্যে থাকিয়া কুলি-মজুরদের আবেদন-নিবেদনকে বুটের ঠোক্কর লাগাইতেছেন। সবারই অন্তরে একটা বিদ্রোহের ভাব আত্ম-সম্মানের স্থূল সংস্করণরূপে নিদ্রিত থাকে, যেটা খোঁচা খাইয়া খাইয়া জর্জরিত না হইলে মরণ-কামড় কামড়াইতে আসে না। কিন্তু ইহাতে এই মনুষ্যত্ববিহীন ভোগবিলাসী কর্তার দল ভয়ানক রুষ্ট হইয়া উঠেন, তাঁহারা তখনও বুঝিতে পারেন না যে, এ অভাগাদের বেদনার বোঝা নেহাত অসহ্য হওয়াতেই তাহাদের এ-বিদ্রোহের মাথা ঝাঁকানি। উন্নত আমেরিকা-ইউরোপেই ইহার প্রথম প্রচলন। সেখানে এখন লোকমতের উপরই শাসন প্রতিষ্ঠিত, এই গণতন্ত্র বা ডিমোক্র্যাসিই সেদেশে সর্বেসর্বা; তাই

শ্রমজীবীদলেরও ক্ষমতা সেখানে অসীম। তাহারা যেরকম মজুরি পায়, তাহাদের স্বাস্থ্য-শিক্ষা আহার বিহার প্রভৃতির যে রকম সুখ-সুবিধা, তাহার তুলনায় আমাদের দেশের শ্রমজীবীগণের অবস্থা কশাইখানার পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তাই এতদিন নির্বিচারে মৌন থাকিয়া মাথা পাতিয়া সমস্ত অত্যাচার-অবিচার সহিয়া সহিয়া শেষে যখন আজ রক্তমাংসে শরীরে তাহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তাহারাও মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। এই বুরোক্র্যাসি বা আমলাতন্ত্র-শাসিত দেশেও তাহারা যখন তাহাদের দুঃখ-কষ্ট-জর্জরিত ছিন্নভিন্ন অন্তরের এমন বিদ্রোহ-ধ্বজা তুলিল, তখন যাঁহার অন্তঃকরণ বা Sentiment বলিয়া জিনিস আছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, ইহাদের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ কত বেশি অসহনীয় তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এই ধর্মঘটের আগুন এখন দাউদাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে নিভিবার নয়, কেননা ভারতেও এই পতিত উপেক্ষিত নিপীড়িত হতভাগাদের জন্য কাঁদিবার লোক জন্মিয়াছে, এদেশেও মহত্তর মানবতার অনুভব সকলেই করিতেছেন। সুতরাং শ্রমজীবী দলেও সেই সঙ্গে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ডিমোক্র্যাসির জাগরণও এ-দেশে দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পড়িবে কেহই উহাকে রুখিতে পারিবে না। পশ্চিম হইতে পূর্বে ক্রমেই ইহা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে এবং করিবে। এ ধর্মঘট ক্লিষ্ট মুমূর্ষ জাতের শেষ কামড়, ইহা বিদ্রোহ নয়।

নবযুগ

আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহা আনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মধ্যযুগের মহা উদ্‌বোধন! আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপূর্ব মুক্তি-কাঙাল বেশ। ওই শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দিদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙ্গিবে। ওই শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ! ওই শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ শঙ্খ! ওই শোনো ইস্‌রাফিলের শিঙায় নব সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল! ওই যে ভীম রণ কোলাহল, তাহাতেই মুক্তিকামী দৃপ্ত তরুণের শিকল টুটার শব্দ ঝনঝন করিয়া বাজিতেছে! সাগ্নিক ঋষির ঋক্‌মন্ত্র আজ বাণীলাভ করিয়াছে অগ্নি-পাথারে অগ্নি-কল্লোলে। আজ নিখিল উৎপীড়িতের প্রাণ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে ওই মন্ত্র-শিখার পরশ পাইয়া। আজ তাহারা অন্ধ নয়, তাহাদের চোখের উপরকার কৃষ্ণ পর্দা তীব্র বহ্নি-ঘাতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নয়নে আজ মুক্তিজ্যোতি বিস্ফারিত। আজ নূতন করিয়া – মহা গগনতলে দাঁড়াইয়া ওই অনাদি অসীম মুক্ত শূন্যতার পানে তাহারা চাহিয়া আছে, কোথায় সে-অনন্তমুক্তি, আর কোথায় তাহারা পড়িয়া আছে বন্ধন-জর্জরিত। নরে আর নারায়ণে আজ আর ভেদ নাই। আজ নারায়ণ মানব। তাঁহার হাতে স্বাধীনতার বাঁশি। সে বাঁশির সুরে সুরে নিখিল মানবের অণু-পরমাণু ক্ষিপ্ত হইয়া সাড়া দিয়াছে। আজ রক্ত-প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব নব প্রভাতি ধরিয়াছে – 'পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরি!' এ সুর নবযুগের। সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর রুশিয়া শুনিয়াছে আয়র্ল্যান্ড শুনিয়াছে, তুর্ক শুনিয়াছে, আরও অনেকে শুনিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্থান, – জর্জরিত, নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ।

ভারত যেদিন জাগিল, সেদিন নিজের পানে চাহিয়া সে নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সেদিন সর্বাপেক্ষা অপমানিত পদানত ঘৃণ্য সে। কত শত বর্ষের কত সহস্র শৃঙ্খলের কত লক্ষ বাঁধনই না মোচড় খাইয়া খাইয়া দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে – তাহার অস্থি-পঞ্জর ভেদ করিয়া মর্মেরও মর্মস্থলে! কত গোলা, কত গুলি, কত বল্লম, কত তলোয়ারই না তাহার বুক ঝাঁঝরা করিয়া দিয়াছে! পৃষ্ঠে তাহার নিষ্করুণ বেত্রাঘাত ও দুর্বিনীত পদাঘাতের দুর্বিষহ বেদনা-ঘা। গর্দানে তাহার নির্দয় খামখেয়ালি পশুশক্তির বিপুল জগদ্দল

শিলা। চক্ষে তাহার সাতপুরু করিয়া কাপড় বাঁধা। সেই যে গা মোড়া দিয়া উঠিল, অমনি তাহার আগেকার কাঁচা ঘায়ে সপাং সপাং করিয়া জল্লাদের লৌহ-হস্তের কাঁটার চাবুক বসিল। অসহনীয় সে নির্মম অপমানে, সে যখন ক্ষিপ্তের মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া গর্দানের বোঝা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শির উঁচু করিয়া তাকাইল, তখন কশাই-এর ভোঁতা ছোরা দিয়া কচলাইয়া কচলাইয়া তাহার প্রাণপ্রিয় সন্তানগুলিকে তাহার বুকের উপর রাখিয়া হত্যা করা হইল। হা হা করিয়া যখন মা তাহার বাছাদের রক্ষা করিতে গেল, তখন তাহারই দলিত শিশুর কলিজামথিত রক্তের বিপুল ঝাপটা তাহার মুখে ছিটাইয়া দেওয়া হইল! সেই সন্তানের রক্ত-মাখানো দৃষ্টি দিয়া সে জলভরা চোখে দেখিল, পূর্বতোরণে অগ্নিরাগে লেখা রহিয়াছে, 'নবযুগ' । নয়ন দিয়া তাহার হুহু করিয়া অশ্রুর শত পাগল-ঝোরা ছুটিল। সে তাহার কোলের কাটা সন্তানের মুণ্ড ফেলিয়া দুই ব্যগ্র বাহুর ব্যাকুল আলিঙ্গন মেলিয়া নবযুগকে আহ্বান করিল, 'তুমি এসো'! নবযুগ সেই ব্যাকুল কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল, 'আর আমায় ছাড়িও না মা। এমনই করিয়া যুগে যুগে আমায় আহ্বান করিয়ো।'

আবার দূরে সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর বাজিয়া উঠিল। রুশিয়া বলিল, 'মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতা-বিরোধীর শির! ভাঙো দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে? এই 'খোদার উপর খোদকারী' শক্তিকে দলিত করো। এই স্বার্থের শাসনকে শাসন করো!' 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া তুর্কি সাড়া দিল। তাহার শূন্য নতশিরে আবার অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত কৃষ্ণশিখ ফেজের রক্তরাগ স্বাধীনতাপহারীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল। শিথিল মুষ্টির ভূলুণ্ঠিত রবাব আবার আস্ফালন করিয়া উঠিল। আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এখনও বিশ্বে দানবশক্তির বজ্রমুষ্টি আমাদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। এ অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বঁচিবে না। যজ্ঞ জ্বলুক। এ হোম-শিখায় যদি কেহ যোগ না দেয়, আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দিব।' এমন সময় ভারত জাগিল। এত দিনে ভারতের বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ আঁখি মেলিযা চাহিলেন। ভারত ব্যাপিয়া হর্ষ-বাণীর মহা কল্লোল কলকল নিনাদে ধ্বনিত হইল 'আবিরাবির্ম এধি' ! আবির্ভাব হও! আবির্ভাব হও!! সারা বিশ্ব কান পাতিয়া সে মুক্তিকল্লোল শুনিল। যুগাবতারের কাঙাল বেশে করুণ নয়নপাতে সারা বিশ্বের আর্ত-নিখিলের বন্ধন-কাতরতা আর মুক্তি-লিপ্সা মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল। একই দুঃখে আজ দুঃখী জনগণ দেশ-জাতি-সমাজের বহির্বন্ধন ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। আজ তাহারা এক, তাহারা একই ব্যথায় ব্যথিত, নিপীড়িত সত্য মানবাত্মা। আজ কেহ কাহাকেও বাহির হইতে দেখে নাই। অন্তর দিয়া পরস্পরের বন্ধন বেদনাতুর অন্তর দেখিয়াছে। তাহাদের উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত রবে – ওই দেখো – বুঝি বন্ধন-প্রয়াসীর মুখ কালো হইয়া গেল, হস্তমুষ্টি শিথিল হইয়া গেল।

ওই শোনো নবযুগের অগ্নিশিখা নবীন সন্ন্যাসীর মন্ত্রবাণী। ওই বাণীই রণক্লান্ত সৈনিককে নব প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ওই শোনো তরুণ কণ্ঠের বীরবাণী, – আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিদ্বেষ নাই, জাতি-বিদ্বেষ নাই, বর্ণ-বিদ্বেষ নাই, আভিজাত্যাভিমান নাই। আজ আমরা আমাদের এই মুক্তিকামী নিহত ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতেছি। পরস্পরকে ভাই বলিয়া, একই অবিচ্ছিন্ন মহাত্মার অংশ বলিয়া অন্তরের দিক হইতে চিনিয়াছি। এই রক্ত-সমাধি পাশে দাঁড়াইয়া আমরা যেন সব স্বার্থ ভুলিয়া যাই। একই বিশ্বে একই বিশ্বমাতার বড়ো-ছোটো ভাই বলিয়া যেন করুণা-ধারায় আমাদের বুক সিক্ত হইয়া ওঠে। আজ এ মহামিলনের যেন এতটুকু দীনতা থাকে না। এই মহামানবের সাগরতীরে শ্মশান-বেলায় আমাদের এই যুগবাঞ্ছিত মহামিলন পবিত্র হউক, শাশ্বত হউক!

দাঁড়াও জন্মভূমি জননী আমার! একবার দাঁড়াও!! যেদিন তুমি সমস্ত বাধা-বন্ধন-মুক্ত মহা-মহিমময়ী বেশে স্বাধীন বিশ্বের পানে অসংকোচ-দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইবে, সেদিন যেন নিজের এই ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ, ঝাঁঝরাপারা বক্ষ, সুত-শোণিত-লিপ্ত ক্রোড় দেখিয়া কাঁদিয়ো না! তোমার পুত্র-শোকাতুর বুকের নিবিড় বেদনা সেদিন যেন উছলিয়া উঠে না, মা! সেদিন তুমি তোমার মুক্ত শিশুদের হাত ধরিয়া বিশ্বমঞ্চে বীরপ্রসূ জননীর মতো উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়ো। ওই দূর সাগর পার হইতে তোমার মুখে সেদিন যেন নব প্রভাতের তরুণ হাসি দেখি। যে বীরপুত্র তাহার তরুণ অসমাপ্ত জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমার মুক্তির জন্য বলিদান দিয়া বিদায় লইয়াছে, সেদিন তাহাকে হয়তো তোমার বেশি করিয়া মনে পড়িবে। কিন্তু সেদিন আর চোখের জল ফেলিয়ো না, মা! বুক-জোড়া হাহাকার তোমার সেদিন কোলের সন্তানদের দেখিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিয়ো।

এসো ভাই হিন্দু! এসো মুসলমান! এসো বৌদ্ধ! এসো ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখো, পাশে তোমাদের মহা শয়নে শায়িত ওই বীর ভ্রাতৃগণের শব। ওই গোরস্থান – ওই শ্মশানভূমিতে – শোনো শোনো তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ পবিত্রস্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই। ওই শহিদ ভাইদের মুখ মনে করো, আর গভীর বেদনায় মূক স্তব্ধ হইয়া যাও! মনে করো, তোমাকে মুক্তি দিতেই সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে। উহার সে ত্যাগের অপমান করিয়ো না! ভুলিয়ো না! আজ আর কলহ নয়, আজ আমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে বোনে-বোনে মায়েরে কাছে অনুযোগের আর অভিযোগের এই মধুর কলহ হইবে যে, কে মায়েরে কোলে চড়িবে আর কে মায়েরে কাঁধে উঠিবে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান

আমাদের বাংলার মুসলমান সমাজ যে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে আশাতীতভাবে উন্নতি দেখাইয়াছেন, ইহা সকলেই বলিবেন; এবং আমাদের পক্ষে ইহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে। সাধারণ-অসাধারণ প্রায় সকল বাঙালি মুসলমানই এখন বাংলা পড়িতেছেন, বাংলা শিখিবার চেষ্টা করিতেছেন ইহা বড়োই আশা ও আনন্দের কথা। বাংলা সাহিত্যের পাকা আসন দখল করিবার জন্য সকলেরই মনে যে একটা তীব্র বাসনা জাগিয়াছে, এবং ইহার জন্য আমাদের এই নূতন পথের পথিকগণ যে বেশ তোড়জোড় করিয়া লাগিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই সাহিত্যে আমাদের জীবনের লক্ষণ। ইহারই মধ্যে আমাদের কয়েকজন তরুণ লেখকের লেখা দেখিয়া আমাদের খুবই আশা হইতেছে যে, ইঁহারা সাহিত্যে বহু উচ্চ আসন পাইবেন।

এখন আমাদের বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে সর্বপ্রথম আমাদের লেখক জড়তা দূর করিয়া তাহাতে ঝরনার মতো ঢেউভরা চপলতা ও সহজ মুক্তি আনিতে হইবে। যে সাহিত্য জড়, যাহার প্রাণ নাই, সে নির্জীব সাহিত্য দিয়া আমাদের কোনো উপকার হইবে না, আর তাহা স্থায়ী সাহিত্যও হইতে পারে না । বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লেখকেরই লেখায় মুক্তির জন্য উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ফুটিতে দেখা যায়। হইবে কোথা হইতে? সাহিত্য হইতেছে প্রাণের অভিব্যক্তি, যাহার নিজের প্রাণ নাই, যে নিজে জড় হইয়া গিয়াছে, সে লেখায় প্রাণ দিবে কোথা হইতে? যাহার নিজের বুকে রং-এর আলপনা ফুটে না, সে চিত্রে রং ফুটাইবে কেমন করিয়া? আমাদের অধিকাংশই হইয়া গিয়াছি জড়, কেননা আমাদের জীবন ভয়ানক একঘেয়ে; তাহাতে না আছে কোনো বৈচিত্র্য, না আছে কোনো সৌন্দর্য। তা ছাড়া, ‘বোঝার উপর শাকের আঁটির’ মতো

আমরা নাকি আবার জন্ম হইতেই দার্শনিক, কাজেই বয়স কুড়ি পার না হইতেই আমরা গম্ভীর হইয়া পড়ি অস্বাভাবিক রকমের। আর, গম্ভীর হইলেই অমনি নির্জীব অচেতন প্রাণীর মতো হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। এই যে চলার আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জড়-ভরতের মতো বসিয়া থাকা, ইহাই আমাদের প্রাণশক্তিকে টুঁটি টিপিয়া মারিতেছে। সাহিত্যের মুক্তধারায় থাকিবে চলার আনন্দ, স্রোগের বেগ এবং ঢেউ-এর কলগান ও চঞ্চলতা।

আমাদিগকে, বিশেষ করিয়া আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেক যুবকের লেখা দেখিয়া মনে হয়, ইহা যেন কোনো এক জরাগ্রস্ত বুড়োর লেখা; তাহাতে না আছে প্রাণ, না আছে চিন্তাশক্তি, না আছে ভাব, – শুধু আবর্জনা, কঙ্কাল আর জড়তা। ইহা বড়োই দুঃখের কথা। সাহিত্যকে এই প্রাণের সোনার কাঠি দিয়া জাগাইবার যে জাদুশক্তি, ইহা লাভ করিতে হইলে আমাদের তরুণ সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথম শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শরীর নীরোগ হইলে মনে আপনি একটা বিমল আনন্দ উছলিয়া পড়িতে থাকে। দেখিবেন যে সাহিত্যিকের স্বাস্থ্য যত ভালো, যিনি যত বেশি প্রফুল্লচিত্ত, তাঁর লেখা তত বেশি স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, তত বেশি কলমুখর। নবীন সাহিত্যিকগণ সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকিবার জন্য যদি এক-আধটু করিয়া সংগীতের আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিবেন তাহাদের লেখার মধ্যে এই সংগীত, সুরের এই ঝংকার, উন্মুক্ত প্রফুল্লচিত্তের এই মোহন-বিকাশ ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাদের লেখার মধ্যে এক নূতন মাদকতা, অভিনব শক্তি দান করিতেছে। অধিকাংশ ‘পুঁয়ে মারা’ পিলে-রোগাক্রান্ত সাহিত্যিকের লেখাই দেখিবেন অসুস্থ (morbid) ; ইহাই সাহিত্যের স্বচ্ছ ধারায় আবিলতা আনে। যাঁহার চিত্ত যত নিরাবিল, নির্মল, উন্মুক্ত, হাস্য-মুখর, তাঁহার লেখাও তত নূতন নূতন সম্পদে ভরা (rich)। ইউরোপের লোকেরা যেমন স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, খেলাধুলা, দৌড়-ঝাঁপ, মারামারি, হাসি-খুশি যেমন তাহাদের নিত্যকার সঙ্গী, তাহাদের লেখার মধ্যেও ঠিক তাহাদের জীবনের ওইসব গুণ সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে।

অপরপক্ষে, উহারই বিপরীত সমস্ত দোষসম্পন্ন বলিয়া আমাদের লেখা, আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টি আবার তেমনই সংকীর্ণ, ভণ্ডামি, অসত্য, রোগের বীজাণু প্রভৃতিতে ভরা। লেখকের লেখা হইতেছে তাঁহার প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি। যেখানে লেখক সত্য, তাঁহার লেখাতেও সে-সত্য সত্যভাবেই ফুটিয়া উঠিবে; যেখানে লেখক মিথ্যা, সেখানে সেই মিথ্যাকে তিনি হাজার চেষ্টা করিলেও লুকাইতে পারিবেন না। সাধারণের চক্ষে যদি না পড়ে, তবে জহুরির চক্ষে তাহা পড়িবেই পড়িবে। সাহিত্যে এই প্রাণ, এই উদ্দাম-চঞ্চলতা, এই উদার মুক্তি আনয়নের চেষ্টা আপাতত আমাদের মাত্র দুই একজন তরুণ সাহিত্যিক ভিন্ন অন্য কারুর লেখায় দেখিতে পাইতেছি না। সেই গড্ডলিকা প্রবাহ। সাহিত্যে যে একটা নূতন ধারা চলিয়াছে, সে-সম্বন্ধে আমাদের অনেক নূতন লেখক এখনও অন্ধ। এই সব কারণে সাহিত্যিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশর মতো উন্মুক্ত উদার, তাহাতে কোনো ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বড়ো-ছোটো জ্ঞান থাকিবে না। বাঁধ-দেওয়া ডোবার জলের মতো যদি সাহিত্যিকের জীবন পঙ্কিল, সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্যসাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হইবে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আঁতুড়-ঘরেই মারা যাইবে। যাঁহার প্রাণ যত উদার, যত উন্মুক্ত, তিনি তত বড়ো সাহিত্যিক। কারণ, সাহিত্য হইতেছে বিশ্বের, ইহা একজনের হইতে পারে না। সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথায় ছোঁয়া দিবেন। সাহিত্যিক যতই কেন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে কোনো লোক বলিতে পারে, ইহা তাঁহারই অন্তরের অন্তরতম কথা; ইহা তাঁহারই বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল, প্রকাশের পথ পাইতেছিল না। এইরূপেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকেই বলে সাহিত্যে সর্বজনীনতা।

এই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ রবীন্দ্রনাথ এমন জগদ্‌বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পায় না, তাহা স্থায়ী সাহিত্য নয়, খুব জোর দু-দিন আদর লাভের পর তাহার মৃত্যু হয়। আমাদিগকেও তাই এখন করিতে হইবে সাহিত্যে সর্বজনীনতা সৃষ্টি। অবশ্য, নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া, না হারাইয়া। যিনি যে দেশেরই হউন, সকলেরই অন্তরের কতকগুলি সত্য আছে, সূক্ষ্মতম ভাব আছে, যাহা সকল দেশের লোকের পক্ষেই সমান; সাহিত্যসৃষ্টির সময় ভিতরের এইসব সূক্ষ্মদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের গূঢ় রহস্যকে বিশ্লেষণ করিয়া সত্যের সৌন্দর্য ও মঙ্গল ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, – এই মহাশক্তি আমাদের তরুণ লেখক সম্প্রদায়কে অর্জন করিতে হইবে। সত্য যদি লক্ষ্য হয়, সুন্দর ও মঙ্গলের সৃষ্টি সাধনা ব্রত হয়, তবে তাঁহার লেখা সম্মান লাভ করিবেই লরিবে। অন্যের ঠিক প্রাণে গিয়া আঘাত করিবার মতো শক্তি পাইতে নিজের প্রাণ থাকা চাই। এসব কথা আমরা শুধু কোনো বিশেষ লেখক-সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়া বলিতেছি না; ইহা ঔপন্যাসিক, কবি, ছোটোগল্প-লেখক সকলেরই প্রতি প্রযোজ্য। এই তিন রকমের লেখকের মধ্যে কেহই ছোটো নন, কারণ প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য – সৃষ্টি। তিনিই আর্টিস্ট, যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (Execution of truth), এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। আমাদের নবীন তরুণ আর্টিস্ট সাহিত্যিক ও কবিগণ এই কয়েকটি কথা মনে রাখিয়া স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টির দিকে চেষ্টা ও প্রাণ প্রয়োগ করিবেন, ইহাই আমাদের বাসনা। আমাদের এ আশা পূর্ণ-হউক!

বাঙালির ব্যবসাদারি

‘বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী’ কথাটা যেমন দিনের মতো সত্য, ‘বাণিজ্যে বসতে মিথ্যা’ কথাটা তেমনই রাতের মতো অন্ধকার। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি না করিতে পারিলে জাতির পতন যেমন অবশ্যম্ভাবী, সত্যের উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না করিলে বাণিজ্যের পতনও আবার তেমনই অবশ্যম্ভাবী। মদকে মদ বলিয়া খাওয়ানো তত দোষের নয়, যত দোষ হয় মদকে দুধ বলিয়া খাওয়ানোতে। দুধের সঙ্গে জল মিশাইয়া বিক্রি করিলে লাভ হয় যত, প্রবঞ্চনা করার পাপটা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। একটা জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা যত বড়ো হয় হউক, কিন্তু প্রবঞ্চনা বা মিথ্যার বিনিময়ে যেন তাহার জাতির বিশ্বস্ততা আর সুনাম বিক্রি করিয়া সে ছোটো না হইয়া বসে। ভণ্ড লক্ষপতি অপেক্ষা দরিদ্র তপস্বী ঢের ভালো। হাঁ, এখন কথা হইতেছে – বাণিজ্য দ্বারা আমরা স্বজাতির নাম করিব, স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিব, না – অন্য বড়ো জাতির নাম দিয়া নিজের নাম ভাঁড়াইয়া বড়ো হইয়া সেই বড়ো জাতিরই তেলা মাথায় তেল ঢালিব? কথাটা একটু খোলসা করিয়া বলি।

আমাদের বাঙালিদের হিন্দু-মুসলমান অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বেশ একটু ঝোঁক দিয়াছেন, সেটা খুব মঙ্গলের কথা। তবে ইহার মধ্যে অমঙ্গলের কথা হইতেছে এই যে, ইঁহাদের অনেকেই নিজের বা স্বজাতির নাম ভাঁড়াইয়া ইংরাজি নামে নিজের নূতন নামকরণ করিতেছেন! কী সুন্দর মৌলিকতা! যিনি অতটা না করেন, তিনি আবার নিজের পৈতৃক নামটাকে বিপুল গবেষণার সহিত বহু কসরত করিবার পর এমন একটা অস্বাভাবিক অশ্বডিম্বে পরিণত করিয়া বসেন, যাহা আমাদের পূর্বে বা পরপুরুষের কোনো ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন না, ইনিকিনি? এইরূপে কৃষ্ণকে ক্রিস্টো রূপে বাজারে বসাইয়া কতটা সুবিধা হয় জানি না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ইহাতে অসুবিধাটাই হয় বেশি। শুনিয়াছি, এইরকম কালা চামড়ায় সাদা পালিশ বুলাইলে নাকি দুই-একজন শ্বেতদ্বীপবাসী বা বাসিনী ভুলক্রমে ওই দোকানে গিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আসল ব্যাপার বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তেই সওদা করিয়া চলিয়া যান; কিন্তু প্রতারণা ধরা পড়িলে যে আবার অনেকে মুখের উপরেই দোকানদারকে প্রবঞ্চক ভণ্ড বলিয়া মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন, এটাও সত্য! অনেকে ভদ্রতার খাতিরে বাহিরে কিছু না বলিলেও মনে মনে দেশীয় দোকানদারের এই ক্ষুদ্রত্বের নিন্দা না করিয়া পারেন না। আর, নাম ভাঁড়াইয়া কোনো কাজ করিবার পর আসল নামটা প্রকাশ হইয়া গেলে কেহ যদি মুখের উপরেও গালাগালি করে, তাহা নির্বিকার চিত্তে হজম করা ভিন্ন কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু, দ্বারে আসল নামটা লেখা থাকিলে অন্তরের বাহিরের এসব কোনো বিড়ম্বনাই আর সহ্য করিতে হয় না। তা ছাড়া, এইরকম কালার গায়ে সাদার দাগ লাগাইয়া লাভও যে খুব বেশি হয় তাহা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ ইহাতে এই রকম দোকানদারগণ যেমন দু-একটা বিদেশি খরিদ্দার পান, তেমনই আবার অনেকগুলি স্বদেশি খরিদ্দারও হারান। কেননা আমাদের দেশের শহরের সোজা বা পাড়াগাঁয়ের ভদ্র মাঝারি লোকে সহজে সাহেবের দোকান মাড়াইতে চান না। ইঁহাদের কেহ বা ওসব বিজাতীয় হাঙ্গামের মধ্যে যাইতে চান না, কেহ বা স্বদেশি দোকানেই জিনিস কিনিতে ভালোবাসেন, আবার কেহ বা নানান দিক দিয়া নিজের দীনতা ধরা পড়িবার ভয়েই ওসব দোকানে যান না।

আমাদের অনেক দেশীয় লোকের আবার একটা ধারণা এই যে, সাহেবের দোকানের জিনিসের দাম দেশীয় দোকানের চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই বেশি দামে দুই-চারিটা জিনিস সাহেবদের বিক্রি করিতে পারিলেও অন্য দিক দিয়া এসব দোকানের অনেক ক্ষতি। সাহেব খরিদ্দারগণ বেশি দামে দামি জিনিস কিনিলেও তাঁহারা সংখ্যায় কম। সে-অনুপাতে কম-দামি জিনিসের ক্রেতা বহু ... দেশীয় লোকের অপেক্ষা বেশি টাকার জিনিসও দোকানে বিক্রি হয় না। অথচ, যদি দোকানদার বাণিজ্যে পসার করিয়া একবার সুনাম অর্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে বহু বিদেশি বা সাহেব-খরিদ্দার আপনিই জুটিয়া যাইবে। এই ধরুন, আমাদের

বটকৃষ্ণ পালের কথা। ইনি অনায়াসেই নিজের পৈতৃক নাম কাটছাঁট করিয়া অন্তত, মন্টোক্রিস্টো পল' হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ব্যবসায়ে যদিই বা পসার হইত, কিন্তু সকলের নিকট এত নাম হইত না, এবং আমরাও গর্বের সহিত একজন বাঙালি ব্যবসাভিজ্ঞ লোকের নাম যেখানে-সেখানে উদাহরণস্বরূপ পেশ করিতেও পারিতাম না। বেনামিতে যে দু-একজন বাঙালি ব্যবসাদার বেশ একটু পসার করিয়াছেন, তাঁহাদের আমরা বাঙালি বলিতে সংকোচ করি, লজ্জা হয়। কেননা, তাঁহারা নিজেই সর্বপ্রথমে নিজের বাঙালিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কাজেই ইঁহারা হইয়া পড়িয়াছেন বাদুরের মতন – না পাখি, না পশু!

তাহা ছাড়া, ইহা আত্মপ্রবঞ্চনা নয় কি? ইহাতে নিজেকে, দেশকে, জাতিকে ছোটো করিয়া দেখা হয় না কি? নিজের কৃতিত্বে দেশের লোকের সুনামে, জাতির আত্মবিশ্বাসে আমাদের নিজের লোকেরাই কত বেশি হেয় ক্ষুদ্র ধারণা পোষণ করে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কেন, আমরা কী জগতের এতই ঘৃণ্য অস্পৃশ্য জীব যে, আমাদিগকে আমাদের নিজ সত্যিকার পরিচয় লুকাইতে হইবে? আমরা কী এতই অমানুষ, এবং যাহাদের নামের দৌলতে এই জঘন্য অর্থ-লাভ তাহারাই কী এত মস্ত মানুষ? দেখিয়াছি, অনেকে তথাকথিত নীচ বংশে জন্ম বলিয়া নিজের পিতৃপুরুষের পরিচয় গোপন করে, কিন্তু তবুও শান্তি পায় কি? লোকে তাহার এই মিথ্যা মুখোশে বরং আরও টিটকারি দেয় না কি? সে নিজের অন্তরেই নিজে লজ্জাতুর ছোটো হইয়া যায় না কি? তাহার চেয়ে তাহার গৌরব করিবার ছিল, যদি সে বুক ফুলাইয়া তাহার পিতৃপুরুষের পরিচয় দিয়া নিজের কৃতিত্বে আপন মনুষ্যত্বের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে পারিত যে, জন্মটা কিছুই নয় – পুরুষকারই হইতেছে আসল জিনিস। তাহাতে তাহার নিজের অন্তরেও সে বল পাইত, আনন্দ পাইত এবং অন্যেও তাহার নির্ভীকতার মনুষ্যত্বের কাছে সসম্মানে মাথা নত করিত। আমরা আজ ভারতে এক অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিতে চলিতেছি, আর আজও যদি আমাদের আত্মসম্মান না জাগে – আজও যদি আমরা আত্মবিশ্বাসে ভর করিয়া নিজের মনুষ্যত্ব ও পুরুষকারের জোরে মাথা উঁচু করিযা বিশ্বের মুক্ত-পথে চলিতে না পারি, তবে আমাদের জাতিগঠন তো দূরের কথা, মুক্ত-দেশের অন্যে এ-কথা শুনিলে মাথায় টোক্কর লাগাইয়া বলিয়া দিবে যে, আগে মাথা উঁচু করে চলতে শেখো।

যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা এখন অপরিবর্তনীয়, কিন্তু যাঁহাদের সাহস আছে, আত্মসম্মান আছে, জাতিকে যিনি বড়ো করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহার উচিত এক্ষুনি এ-মিথ্যে মুখোশটাকে দূর করিয়া ফেলিয়া আবার নতুন করিয়া নিজের বিশ্বাসে নিজের কৃতিত্ব, কর্মকুশলতা ও পৌরুষের পুঁজি লইয়া ব্যবসা-ক্ষেত্রে দাঁড়ানো। তাহাতে তাঁহার নাম, তাঁহার দেশের নাম, তাঁহার জাতির নাম। আর সবচেয়ে বড়ো জিনিস তাঁহার নিজের অন্তরের শান্ত পূত মহাতৃপ্তির অপূর্ব আত্মপ্রসাদের বিপুল গৌরব।

এই জাতীয়তার যুগে, এই নিজেকে সত্য বলিয়া জানার সাহসী কালেও ওই পুরোনো বিশ্রী অভিনয়ের হেয় অনুকরণ হইতেছে বলিয়া আমরা এত কথা বলিলাম। ডোম যদি ডোম বলিয়া সসংকোচে পথ ছাড়িয়া আমাকে দীর্ঘ গোলামি সালাম ঠোকে, তাহা হইলে স্বতই তাহার প্রতি আমার একটা উঁচু-নিচুর ভাব আসে, কিন্তু সে যদি ডোম বলিয়া পরিচয় দিয়া সহজ হইয়া আমার পথে মানুষের মতো দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে বাহিরে আমি অভ্যাসবশত যতই ক্ষুব্ধ হই, অন্তরে তাহার আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্বজ্ঞানকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারি না। সমাজ বা জন্ম লইয়া এই যে বিশ্রী উঁচু-নিচু ভাব, তাহা আমাদিগকে জোর করিয়া ভাঙিয়া দিতে হইবে। আমরা মানুষকে বিচার করিব মনুষ্যত্বের দিক দিয়া, পুরুষকারের দিক দিয়া। এই বিশ্ব-মানবতার যুগে যিনি এমনই করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন, তাঁহাকে আমরা বুক বাড়াইয়া দিতেছি – তাঁহাকে নমস্কার করি!

হাঁ, – ব্যক্তিত্বের দিক ব্যতীত দেশীয় লিমিটেড কোম্পানিগণও তাহাদের ম্যানেজিং এজেন্টের

কল্পিত ইংরেজি নাম রাখিয়া লোকের চক্ষে ধূলা দিতেছেন, কী বিশ্রী প্রতারণা! কী ঘৃণ্য অধঃপতন!

আজ আমরা তাঁহাকেই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, তাঁহারই পায়ের ধূলা মাথায় লইব, – তিনি মুচি, ডোম, হাড়ি, যেই হউন, – যিনি মহাবীর কর্ণের মতো উচ্চশিরে সর্বসমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবেন, ‘আমি সূতপুত্রই হই, আর যেই হই, আমার পুরুষকার আমার গৌরব, আমার মনুষ্যত্বই আমার ভূষণ!’

ভাব ও কাজ

ভাবে আর কাজে সম্বন্ধটা খুব নিকট বোধ হইলেও আদতে এ জিনিস দুইটায় কিন্তু আশমান-জমিন তফাৎ।

ভাব জিনিসটা হইতেছে পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো, একটা অবাস্তব উচ্ছ্বাস মাত্র। তাই বলিয়া কাজ মানে যে সৌরভবিহীন পুষ্প, ইহা যেন কেহ মনে করিয়া না বসেন। কাজ জিনিসটাই ভাবকে রূপ দেয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে বস্তুজগতের।

তাই বলিয়া ভাবকে যে আমরা মন্দ বলিতেছি বা নিন্দা করিতেছি, তাহা নহে; ভাব জিনিসটা খুবই ভালো। মানুষকে কব্জায় আনিবার জন্য তাহার সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিয়া তাহাকে মাতাইয়া না তুলিতে পারিলে তাহার দ্বারা কোনো কাজ করানো যায় না, বিশেষ করে আমাদের এই ভাব-পাগলা দেশে। কিন্তু শুধু ভাব লইয়াই থাকিব, লোককে শুধু কথায় মাতাইয়া মশগুল করিয়াই রাখিব, এও একটা মস্ত বদ-খেয়াল। এই ‘ভাব’কে কার্যের দাসরূপে নিয়োগ করিতে না পারিলে ভাবের কোনো সার্থকতাই থাকে না। তাহা ছাড়া ভাব দিয়া লোককে মাতাইয়া তুলিয়া যদি সেই সময় গরমাগরম কার্যসিদ্ধি করাইয়া লওয়া না হয়, তাহা হইলে পরে সে ভাবাবেশ কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়। অবশ্য, এখানে কার্যসিদ্ধি মানে স্বার্থসিদ্ধি নয়। যিনি ভাবের বাঁশি বাজাইয়া জনসাধারণকে নাচাইবেন, তাঁহাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হইতে হইবে। তিনি লোকদিগের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাবকে জাগাইয়া তুলিবেন মানুষের কল্যাণের জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। তাঁহাকে একটা খুব মহত্তর উদ্দেশ্য ও কল্যাণ কামনা লইয়া ভাবের বন্যা বহাইতে হইবে, নতুবা বানভাসির পর পলি পড়ার মতো সাধারণের সমস্ত উৎসাহ ও প্রাণ একেবারে কাদাঢাকা পড়িয়া যাইবে। এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, লোকের কোমল অনুভূতিতে গা দেওয়া পাপ। কেননা, অনেক সময় অনুপযুক্ততা-প্রযুক্ত ইহা হইতে সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলে। আগে হইতে সমস্ত কার্যের বন্দোবস্ত করিয়া বা কার্যক্ষেত্র তৈয়ার রাখিয়া তবে লোকদিগকে সোনার কাঠির ছোঁয়া দিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে। নতুবা তাহারা যখন জাগিয়া দেখিবে যে, তাহারা অনর্থক জাগিয়াছে, কোনো কার্য করিবার নাই, তখন মহা বিরক্ত হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িবে এবং তখন আর জাগাইলেও জাগিবে না। কেননা, তখন যে তাহারা জাগিয়া ঘুমাইবে এবং জাগিয়া ঘুমাইলে তাহাকে কেহই তুলিতে পারে না। তাহা অপেক্ষা বরং কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভালো, সে-ঘুম ঢোল কাঁসি বাজাইয়া ভাঙানো বিচিত্র নয়।

এ কথাটা যে একটা মস্ত সত্যি, তাহা এতদিনে আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। এই যে সেদিন একটা হুজুগে মাতিয়া হুড়মুড় করিয়া হাজার কতক স্কুল-কলেজের ছাত্রদল বাহির হইয়া আসিল, কই তাহারা তো তাহাদের এই সৎ সংকল্প, এই মহৎ ত্যাগকে স্থায়ীরূপে বরণ করিয়া লইতে পারিল না। কেন এমন হইল? একটা সাময়িক উত্তেজনার মুখে এই ত্যাগের অভিনয় করিতে গিয়া ‘স্পিরিট’কে কী বিশ্রী ভাবেই না মুখ ভ্যাংচানো হইল! যাহারা শুধু ভাবের চোটে না বুঝিয়া না শুঝিয়া শুধু একটু নামের জন্য বা বদনামের ভয়ে এমন করিয়া

তাহাদের ‘স্পিরিট’ বা আত্মার শক্তির পবিত্রতা নষ্ট করিল, তাহারা কী দরকার পড়িলে আবার কাল এমনই করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে? আজ যাহারা মুখে চাদর জড়াইয়া কল্যকার ত্যক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার মুখটি চুন করিয়া ঢুকিল, কাল দেশের সত্যিকার ডাক আসিলে তাহারা কী আর তাহাতে সাড়া দিতে পারিবে! হঠকারিতা করিয়া একবার যে ভোগটা ভুগিল বা ভ্রম করিল, তাহারই অনুশোচনাটা তাহারা কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। – বাহিরে যতই কেন লি-পরওয়া ভাব দেখাক না। এখন সত্যিকার ডাক শুনিয়া প্রাণ চাহিলেও সে লজ্জায় তাহাতে আসিয়া যোগদান করিতে পারিবে না। এইরূপে আমরা আমাদের দেশের প্রাণশক্তি এই তরুণদের ‘স্পিরিট’টাকে কুব্যবহারে আনিয়া মঙ্গলের নামে দেশের মহা শত্রুতা সাধনই করিতেছি না কি? রাগিবার কথা নয়, এখন ইহা রীতিমতো বিবেচনা-সাপেক্ষ। আমাদের এই আশা-ভরসাস্থল যুবকগণ এত দুর্বল হইল কীরূপে বা এমন কাপুরুষের মতো ব্যবহারই বা করিল কেন? সে কি আমাদের দোষে নয়? সাপ লইয়া খেলা করিতে গেলে তাহাকে দস্তুরমতো সাপুড়ে হওয়া চাই, শুধু একটু বাঁশি বাজাইতে পারিলেই চলিবে না। আজ যদি সত্যিকার কর্মী থাকিত দেশে, তাহা হইলে এমন সুবর্ণ সুযোগ মাঝ-মাঠে মারা যাইত না। ত্যাগী অনেক আছেন দেশে, কিন্তু কর্মীর অভাবে বা তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের সত্য সাধনার অভাবে তাঁহারা কোনো ভালো কাজে আর কোনো অর্থ দিতে চাহেন না, বা অন্য কোনোরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতেও রাজি নন। কী করিয়া হইবেন? তাঁহারা তাঁহাদের চোখের সামনে দেখিতেছেন যে, কত লোকের কত মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ধন দেশের নামে, কল্যাণের নামে আদায় করিয়া বাজে লোকে নিজেদের উদর পূর্ণ করিতেছে। যাঁহারা সত্যিকার দেশকর্মী – সে বেচারা সত্যি কথা স্পষ্টভাবে বলিতে গিয়া এই সব কর্মীদের কারচুপিতে পুয়াল চাপা পড়িয়া গিয়াছে, বেচারারা এখন ভালো বলিতে গেলেও এই সব মুখোশ-পরা ত্যাগী মহাপুরুষগণ হট্টগোল বাধাইয়া লোককে সম্পূর্ণ উলটা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে একদম খেলো, ঝুটা ইত্যাদি প্রমাণ করিয়া দেন। সহজ জনসাধারণের সরল মন এসব না ধরিতে পারার দরুন তাহাদের মন অতি অল্পেই ওই সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া উঠে। ‘দশচক্রে ভগবান ভূত’ কথাটা মস্ত সত্যি কথা।

তাহা হইলে এখন উপায় কী? এক সহজ উপায় এই যে, এখন হইতে জনসাধারণের বা শিক্ষিত কেন্দ্রের উচিত, ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হইয়া কান্ডাকাণ্ড ভালোমন্দ জ্ঞান হারাইয়া না ফেলা। ভাব জিনিসটা মদের নেশার চেয়েও গাঢ়। পাঁড়-মাতালরা বলে, ‘মদ খাও, কিন্তু তোমায় যেন মদে না খায়।’ আমরাও বলিব, ভাবের সুরা পান করো ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইয়ো না। তাহা হইলে তোমার পতন, তোমার দেশের পতন, তোমার ধর্মের পতন, মনুষ্যত্বের পতন! ভাবের দাস হইয়ো না, ভাবকে তোমার দাস করিয়া লও। কর্মে শক্তি আনিবার জন্য ভাব-সাধনা করো। ‘স্পিরিট’ বা আত্মার শক্তিকে জাগাইয়া তোলো, কিন্তু তাই বলিয়া কর্মকে হারাইয়ো না। অন্ধের মতো কিছু না বুঝিয়া না শুনিয়া ভেড়ার মতো পেছন ধরিয়া চলিয়ো না। নিজের বুদ্ধি, নিজের কর্মশক্তিকে জাগাইয়া তোলো। তোমার এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই দেশকে উন্নতির দিকে, মুক্তির দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে। এসব জিনিস ভাব-আবিষ্ট হইয়া চক্ষু বুঁজিয়া হয় না। কোমর বাঁধিয়া কার্যে নামিয়া পড়িতে হইবে এবং নামিবার পূর্বে ভালো করিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া দেখিয়া লইতে হইবে, ইহার ফল কী। শুধু হোড়ের মতো বা উদ্‌মো ষাঁড়ের মতো দেয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁসাইয়া নিজের চামড়া তুলিয়া ফেলা হয় মাত্র। দেয়াল-প্রভু কিন্তু দিব্যি দাঁড়াইয়া থাকেন। তোমার বন্ধন ওই সামনের দেয়ালকে ভাঙিতে হইলে একেবারে তাহার ভিত্তিমূলে শাবল মারিতে হইবে।

আবার বলিতেছি, আর ভাবের ঘরে চুরি করিয়ো না। আগে ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখো। কার্যের সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার কথা অগ্রে বিবেচনা করিয়া পরে কার্যে নামিলে তোমার উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হইবে না। মনে রাখিও, তোমার ‘স্পিরিট’ বা আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করিতে তোমার কোনো অধিকার নাই। তাহা পাপ – মহাপাপ!

মুখ বন্ধ

খুব সোজা করিয়া বলিতে গেলে নন-কো-অপারেশন হইতেছে বিছুটি বা আলকুশি, এবং আমলাতন্ত্র হইতেছেন ছাগল! ছাগলের গায়ে বিছুটি লাগিলে যেমন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে, এই আমলাতন্ত্রও তেমন অসহযোগিতা-বিছুটির জ্বালায় বে-সামাল হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিছুতেই যখন জ্বলন ঠাণ্ডা হয় না, তখন ছাগ বেচারি জলে গিয়ে লাফাইয়া পড়ে, দেয়ালে গা ঘষিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে জ্বালা না কমিয়া আরও বাড়িতেই থাকে, উলটো ঘষাঘষির চোটে তাহার চামড়াটি দিব্যি ক্ষৌরকর্ম করার মতোই লোমশূন্য হইয়া যায়। আমলাতন্ত্রের গায়েও বিছুটি লাগিয়াছে এবং তাই তিনি কখনও জলে নামিতেছেন, কখনও ডাঙায় ছুটিতেছেন, আর কখনও বা দেয়ালে গা ঘেঁসড়াইয়া খামকা নিজেরই নুনছাল তুলিতেছেন! তবু কিন্তু জ্বলন আর থামিতেছে না, বরং ক্রমেই বাড়িতেছে। এখন এই আমলাতন্ত্রের ল্যাজের ডগা হইতে মাথার চুল পর্যন্ত সমস্ত কিছুই এত অস্বাভাবিক রকমের বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা দেখিলে হাসিও পায়, কান্নাও আসে। ইহা যেন বহরমপুর বা কসৌলি প্রেরণের পূর্ব লক্ষণ। একটা গান আছে, 'ও যার কপালে আগুন ধরে, তার নাইকো কোথাও সুখ, ব্রহ্মাণ্ড বিমুখ, দুখের উপর দুখ দাও তারে।' বাস্তবিক এখন এই রাজতন্ত্র ওরফে আমলাতন্ত্র মশাই-এর 'অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল!' কেননা অদৃষ্টের ফেরে যাহা কিছু ভালো বুঝিয়া করিতে যাইতেছেন, তাহাই মন্দ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু আমরা বলি কী, এ-সমস্ত নিজেরই কর্মদোষ। কেহ যদি ইচ্ছা করিয়া গা চুলকাইয়া আলকুশি লাগায়, তাহার জন্য দায়ী সে নিজে। – দেশের লোক এখন তাহাদের ঘরের অবস্থা সাদাচোখে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইয়াছে। ঘরে যে সিঁদেলচোর ঢুকিয়াছে, এতদিনে তাহারা তাহা টের পাইয়া চোরের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছে। এখন তাহার অপহৃত জিনিস ছাড়িয়া না দিলে সে কিছুতেই আর টুঁটি ছাড়িবে না। চোরে গৃহস্থে দস্তুর মতো এখন এই ধস্তাধস্তি চলিতেছে। তবে চোরের সুবিধাটা এই যে, সে বেশি জোরালো, তার হাতে হাতিয়ারও আছে, আর গৃহস্থ বেচারা একেবারে নিরস্ত্র। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ তো প্রাণ থাকিতে ঘরের জিনিস পরকে লইয়া যাইতে দিবে না। যাক সেসব কথা। আমরা বলিতেছিলাম, এই আমলা বাবাজিরা এমন করিয়া আর কতদিন ছেলেমানুষি দেখাইবেন? তাঁহারা যেসব বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন, তাহার সকলগুলির পরিচয় দিতে হইলে একটি সপ্তকাণ্ড 'আমলায়ন' লিখিতে হয়। তবে সবচেয়ে ঝাঁজালো বুদ্ধিটা দেখাইতেছেন তাঁহারা, যাহার-তাহার যে-কোনো সময় সটান মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া। আচ্ছা, বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক, এই মুখ বন্ধ করাটা কি যুক্তিসঙ্গত?

ধরুণ, দুইজন লোকের মধ্যে তর্ক হইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে একজন বেশি বলবান; কিন্তু দুর্বল বেচারার গায়ে জোর না থাকিলেও সে মনের জোর লইয়া, সত্যের জোর লইয়া বলবান প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্রমেই ঘায়েল করিয়া ফেলিতেছে; ঠিক ওই সময়েই অনন্যোপায় হইয়া বলবান রাগিয়া বলিয়া উঠে, 'চুপ রও!' অর্থাৎ কিনা তোমার মুখ বন্ধ, তুমি কোনো কথাই বলিতে পাইবে না। যাহার মনের জোর নাই – সত্যের জোর নাই, সে-ই এমন করিয়া গায়ের জোরে দুর্বলকে থামাইতে চেষ্টা পায়। যদি তাহার যুক্তিযুক্তরূপে বুঝাইবার বা মনে সত্য-দাবির জোর থাকিত, তাহা হইলে গায়ের জোর দিয়া বুঝাইবার দরকার হইত না। যাহাদের মনে পাপ, তাহারা বাহিরে যতই গদাইলশকরি চাল দেখাক, অন্তরে তাহারা খ্যাঁকশিয়ালির চেয়েও ভীরু। যেই তাহারা দেখে যে, অন্য কেউ তাহাদের আঁতে ঘা দিতেছে বা মনের পাপটাকে বাহিরে দিনের আলোতে খুলিয়া দেখিতেছে, অমনই তাহারা 'ওই রে চিচিং ফাঁক হল' বলিয়া চেঁচাইয়া চিল্লাইয়া হুমকি দেখাইয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা পায়। কিছুতেই না পারিলে তখন আইনের সিলমোহর! আজকাল ছোটোদারোগা সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া বড়োলাট সাহেব পর্যন্ত সকলেই এই উপায়টাকেই 'বিপদভঞ্জন মধুসূদন' রূপে জাপটিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহারা ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। কেননা ইহাতে উক্ত শ্রীমধুসূদন প্রসন্ন হইয়া

ক্রমেই ভ্রুকুটি-কুটিল হইয়া পড়িতেছেন! কী গেরো! ‘সখি হে, কী মোর করমে লিখি?’ মনে করিয়াছিলেন, এ জলে আগুন না নিভিয়া যায় না; কিন্তু তাহা না হইয়া আগুন ক্রমেই শিখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া চলিতেছে। ইহারা এই সোজা কথাটা বুঝিতেছেন না যে, জোর করিয়া একজনকে চুপ করাইয়া দিলে তাহার ওই না-কওয়াটাই বেশি কথা কয়। কারণ, তখন তাহার একার মুখ বন্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহার হইয়া – সত্যকে, ন্যায়কে রক্ষা করিবার জন্য – আরও লক্ষ লোকের জবান খুলিয়া যায়। বালির বাঁধ দিয়া কি দামোদরের স্রোত আটকানো যায়?

সেদিন চিত্তরঞ্জনকে বলিলে, ‘এখানে আমার এলাকায় টুঁ-টি করিতে পারিবে না! কিন্তু যেই দেখিলে অবস্থা বড়ো বে-গতিক, অমনি সে-হুকুম বাতিল ও না-মঞ্জুর করিয়া ফেলিলে। আবার মি. আলি শেরওয়ানিকে আগ্রায় বক্তৃতা দিতে মানা করিয়াছ। এমন করিয়া খ্যাপা কুকুরের মতন করিয়া যেখানে-সেখানে হাব্‌সাইলে কী হইবে? উলটো জনসংঘ আরও খেপিয়া পাগল হইয়া উঠিবে। যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, সুশীল সুবোধ বালক হও, সাধারণকে সেকথা বুঝাইয়া দাও। তাহা না হইলে অন্যায়কে ঢাকা দিয়া রাখিতে পারিবে না – পারিবে না।

জোর-জবরদস্তি করিয়া কি কখনও সচেতন জাগ্রত জনসংঘকে চুপ করানো যায়? যতদিন ঘুমাইয়াছিলাম বা কিছু বুঝি নাই, ততদিন যাহা করিয়াছ সাজিয়াছে; এতদিন মোয়া দেখাইয়া ছেলে ভুলাইয়াছ, এখনও কি আর ওরকম ছেলেমানুষি চলিবে মনে কর? আমাদের বড়ো ভয় হয়, এ মুখ-বন্ধ আমাদের নয়, তোমাদের। আশা করি আমাদের এ-ভয় মিথ্যা হইবে না!

মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?

আমরা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া যাই নাই হতভাগ্য হাবিবুল্লার হত্যা-বীভৎসতা। আজও মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন খবর আসিয়াছিল যে, সামরিক পুলিশের সঙ্গে একদল মুহাজিরিন গোলমাল করায় কাঁচাগাড়ি নামক স্থানে মুহাজিরিনদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। একজন ভারতীয় সৈন্য তিন তিনবার গুলিবর্ষণ করে, তাহাতে মাত্র একজন নিহত ও একজন আহত হয়! কোনো মূর্খ বিশ্বাস করিবে এ কথা?

আমরা বলি, একটি আঘাতের বদলেই তিনি তিনবার গুলিবর্ষণ করে, এ কোন্ সভ্য দেশের রীতি? তোমাদের তো সিপাহি-সৈন্যের অভাব নাই – বিশেষ করিয়া সেই সীমান্ত দেশে। চল্লিশটি নিরস্ত্র লোককে, তাহারা যদি সত্যই অন্যায় করিয়া থাকে, সহজেই তো গেরেফতার করিয়া লইতে পারিতে। তাহা না করিয়া তোমরা চালাইয়াছিলে গুলি! আর কাহাদের উপর? যাহারা স্বদেশের, স্বজনের মায়া-মমতা ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য তোমাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চলিয়াছিল।

কিন্তু আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইব না, আঘাত খাইয়া খাইয়া, অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তোমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, আর আমাদের নাই? আমরা কী মানুষ নই? তোমাদের একজনকে মারিলে আমাদের এক হাজার লোককে খুন কর, আর আমাদের হাজার লোককে পাঁঠাকাটা করিয়া কাটিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পাইব না? মনুষ্যত্বের, বিবেকের, আত্মসম্মানের, স্বাধীনতার উপর এত জুলুম কেহ কখনও সহ্য করিতে পারে কি? এই যে সেদিন হতভাগারা হাজার বছরের পরিচিত, সারা জীবনের সুখ-দুঃখ-স্মৃতি-বিজড়িত, বাপ-দাদার ভিটাবাড়ি, আত্মীয়-পরিজন, জননী-জন্মভূমির মায়া-মমতা ত্যাগ করিয়া, বড়ো দুঃখে বড়ো কষ্টে জীবনের সঙ্গে জড়ানো এইসব স্নেহ-স্মৃতির বন্ধন জোর করিয়া ছিঁড়িয়া এক মুক্ত স্বাধীন অজানার দিকে পাড়ি দিতেছিল, ইহাদের বেদনা

বুঝিবার অন্তর তোমাদের আছে কি? মনুষ্যত্বের এই যে মস্তবড়ো একটা দিক, পরের বেদনাকে আপন করিয়া নেওয়া – ইহা কি আর তোমাদের আছে? স্বাধীনতাকে, মনুষ্যত্বকে এমন নির্ম্মমভাবে দুই পায়ে মাড়াইয়া চলিবে আর কতদিন? এই অত্যাচারের, এই মিথ্যার বুনিয়াদে খাড়া করা তোমাদের ঘর – মনে কর কি, চিরদিন খাড়া থাকিবে? এই সব অপকর্মের, এই সব অমার্জনীয় পাপের, এই সব নির্মম উৎপীড়নের জন্য বিবেকের যে দংশন তাহা হইতে তোমাদের রক্ষা করিবে কে? এ-মহাশক্তির ভীষণতা আজও কি তোমার চক্ষে পড়ে নাই? তোমাদের অত্যাচারে, জুলুমে নিপীড়িত হইয়া, মানবাত্মা – মনুষ্যত্বের এত পাশবিক অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া মানুষের মতো যাহারা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে পারিল যে, এখানে আর ধর্ম কর্ম চলিবে না, এবং চিরদিনের মতো তোমাদের সংশ্রব ছাড়িয়া তোমাকে সালাম করিয়া বিদায় লইল, – সেই বিদায়ের দিনেও তাহাদের উপর সামান্য পশুর মতো ব্যবহার করিতে তোমাদের লজ্জা হইল না, দ্বিধা হইল না! সামান্য খুঁটিনাটি ধরিয়া, ছল করিয়া গায়ে পড়িয়া তাহাদের সাথে গোলমাল বাধাইলে, হত্যা করিলে! আবার হত্যা করিলে আমাদেরই ভারতীয় সৈন্য দ্বারা! যাহাকে হত্যা করিলে, তাহাকে হত্যা করিয়াও ছাড় নাই, তাহার লাশ তিন দিন ধরিয়া আটকাইয়া রাখিয়া পচাইয়া গলাইয়া ছাড়িয়াছ! মৃতের প্রতিও এত আক্রোশ, এত অসম্মান কেবল তোমাদের সভ্য জাতিই একা দেখাইতে পারিতেছে! তোমাদেরই কিচনার – লর্ড কিচনার মেহেদির কবর হইতে অস্থি উত্তোলন করিয়া ঘোড়ার পায়ে বাঁধিয়া ঘোড়দৌড় করিয়াছে, তোমাদের এই সৈন্যদল যে তাহারই শিষ্য। না জানি আরও কত বাছাদের, আমাদর কতো মা-বোনদের খুলি উড়াইয়াছ, তোমরাই জান। আমাদের যে ভাই আজ তোমাদের হাতে শহিদ হইল, সে এমন এক মুক্ত স্বাধীন দেশে গিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে তোমাদের গুলি পৌঁছিতে পারে না! সে যে মুক্তির সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল! মনে রাখিয়ো, সে খোদার আরশের পায়া ধরিয়া ইহার দাদ (বিচার) মাগিতেছে! দাও, উত্তর দাও! বলো তোমার কী বলিবার আছে!

রোজ কেয়ামত-বা প্রলয় দিন

একজন বহুদর্শী বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমাদের পৃথিবী ধ্বংস (প্রলয় বা রোজ-কেয়ামত) হইবার দিন যত দূর মনে করি, বাস্তবিক তত দূর নয়। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যেসব আলোচনা হইয়াছে, সেই সব লইয়াই আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া ইহা লক্ষ হইতেছে যে, দক্ষিণ পোলার প্রদেশে ভাসমান তুষারের স্তূপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। এডমন্টের ক্যাপ্টেন স্মিতার্থ সর্বপ্রথম ৫০০ ফুট উচ্চ এক তুষার-স্তূপ দেখিতে পান। অতঃপর স্কট সাহেব ৬০০ ফুটেরও উঁচু এক বরফের পাহাড় দেখিতে পান। কিন্তু এজনেটার একজন নাবিক সমুদ্রের উপরেও হাজার ফুটের বেশি উচ্চ এক পর্বত-প্রমাণ বরফ স্তূপ আবিষ্কার করেন এবং তাহাতে সমস্ত পৃথিবী চমকিত হইয়া যায়। পরে নির্ধারিত হয় যে, এই তুষার পর্বত ৯৬১২ ফুট পুরু অর্থাৎ পৌনে দুই মাইলেরও বেশি চওড়া।

দক্ষিণ বিষুবরেখায় অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষার-পর্বতসমূহের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। আর এই জন্যই দক্ষিণ পোলার প্রদেশসমূহ ভয়ানক উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। উত্তর দিকস্থ বহু দূরের ভাসমান তুষারস্তূপসমূহ দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় অত্যধিক শীতের সৃষ্টি করিয়াছে। এখানের শৈত্যের সঙ্গে অন্য স্থানের তুলনাই হয় না। ‘বুইনস এরিস’ নামক স্থানে সম্প্রতি এক তুষার-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই দেশে আর কখনও তুষার-বৃষ্টি হয় নাই।

এসবের মানে কী? প্রফেসর লুইস ও অন্যান্য বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকের মতে আমাদের পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাপ্লাবন ও মহাধ্বংস অতি আসন্ন। যদি সমস্ত দুনিয়াও ধ্বংস না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর একাংশ যে ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাস্তি।

দক্ষিণ মেরুতে যে গগন-চুম্বী বরফের মহা আচ্ছাদন রহিয়াছে, তাহা লম্বাতে চৌদ্দ শত মাইল এবং কত শত মাইল যে পুরু তাহার ইয়ত্তাই নাই! এখন এই যে দক্ষিণ মেরুর আবহাওয়া এই রকমে ক্রমেই অসহ্য উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, ইহার পরিণাম কী? সকলেই জানেন বরফ গরম হইলে গলিয়া যায়। সুতরাং এখন দক্ষিণ মেরুর এই অত্যধিক উষ্ণতার দরুন সেখানের ওই সহস্র সহস্র যোজন-ব্যাপী তুষারের মহাপর্বতসমূহ ভাঙিয়া গলিয়া যাইবে, এবং আকাশ-সমান সচল হিমালয়ের মতো তরঙ্গের রাশি চতুর্দিক ধুইয়া-মুছিয়া লইয়া যাইবে। প্রথমে এই মহা-প্লাবনে আক্রান্ত হইবে পৃথিবীর ঢালু দিক অর্থাৎ দক্ষিণ মহাদেশসমূহ।

পুরাকালে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ধূমকেতুকে ভয়ানক ভয় করিতেন, কেননা তাঁহারা জানিতেন না, ধূমকেতু কী? আমাদের পরবর্তী পিতাগণ এ সম্বন্ধে বেশি জানিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও ধূমকেতুকে অত্যন্ত ভয় করিতেন ও অলক্ষুনে মনে করিতেন। কারণ, তাঁহারা মনে করিতেন এইসব ধূমকেতুর মস্তক নিরেট, সুতরাং পৃথিবীর এত নিকটে আসার দরুন যদি তাহার সহিত দৈবক্রমে পৃথিবীর সংঘর্ষ হইয়া যায়, তাহা হইলে সারা দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে।

এখন আমরা জানিতে পারি, ধূমকেতু নিরেট শক্ত নয়, ইহা কুয়াশার মতো নীহারময়। সুতরাং যদি দৈবক্রমে এক-আধটা ধূমকেতুর পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষও হইয়া যাইত, তাহা হইলে ইহা দ্বারা পৃথিবীর কোনো অংশ গভীর গর্তও হইয়া যাইত না, বা ইহা আমাদিগকে পৃথিবীর আকর্ষণের বাহিরে ছুঁড়িয়া দিতেও সক্ষম হইত না।

কিন্তু ফ্রান্সের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মঁসিয়ে ক্যামিলি ফামারিয়ন সাহেব এক বিভীষিকাময় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহা এই যে, ধূমকেতুর ওই যে নীহারময় পুচ্ছ তাহা বিষাক্ত গ্যাসে ভরপুর। সেইজন্য ধূমকেতু যদি একবার পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিতে পারে, তাহা হইলে ওই বিষাক্ত গ্যাসে সমস্ত পৃথিবী এক নিমেষে প্রাণীশূন্য হইয়া যাইবে, তাহার রূপ-রস-গন্ধ চিরদিনের তরে ধুইয়া-মুছিয়া সাফ হইয়া যাইবে।

ধূমকেতুর সৃষ্টির রাসায়নিক ব্যাখ্যা এখনও সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় নাই, কিন্তু ইহা সহজে সকলে বুঝিতে পারেন যে, ধূমকেতু ইহার পুচ্ছে নিশ্চয়ই গ্যাস ভরিয়া রাখে। এই গ্যাস অনায়াসে আমাদের পৃথিবীর বাতাস হইতে যবক্ষারজান শুষিয়া লইতে পারে; এবং তাহা হইলে যেদিকে যাও সেই দিকেই মরণ আর কী! সাধে কী আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই জিনিসটাকে এত অপছন্দ করিতেন! কথায় বলে, 'ধূমকেতুর মতো সে এসে আমার অদৃষ্টে উদয় হল!' পৃথিবীর অদৃষ্টেও ধূমকেতু বাস্তবিকই অলক্ষুনে ও অমঙ্গলজনক।

যাক, যদি ইহা যবক্ষারজান বাতাস হইতে শুষিয়া লয়, তাহা হইলে আমরা শুধু অক্সিজেন বা অম্লজান বাষ্পই পাইব। সত্য বটে যে, অম্লজান বাষ্প রক্তসঞ্চালন এবং মানসিক ও শারীরিক কর্মপটুতা বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাই বলিয়া শুধু অম্লজান বাষ্প আবার ভয়ানক মারাত্মক। সুতরাং নিশ্বাস-প্রশ্বাসে শুধু উত্তেজন অম্লজান বাষ্প পাইয়া আমাদের শরীর ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং ক্রমে আমরা জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইব।

কয়লা-যুগের সময় এই পৃথিবীর বাতাস কার্বনিক অ্যাসিডের দরুন ভারী ছিল। সেসময় সে-বাতাস মানুষে সহ্য করিতে পারিত না। কেবল মৎস্য ও সরীসৃপজাতীয় জীববৃন্দ স্রোতময়

জলাভূমিতে ও নিশ্চল বাতাসে বাঁচিয়া ছিল। ক্রমশ উদ্ভিদ ও গাছ-গাছড়ার বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওই বিষাক্ত নিশ্চল বাতাস দূর হইয়া যাইতে লাগিল, আকাশ পরিষ্কার হইল এবং এইরূপে এই বাতাস উষ্ণ রক্তময় জীবের উপযোগী হইয়া উঠিল।

বর্তমানে মানব জাতি কয়লা খনন কার্যে ও তাহার সাহায্য গ্রহণে বিষম ব্যস্ত। এই কয়লা কখনকার জানেন কি? ইহা ওই বহু লক্ষ যুগ পূর্বের কার্বনিক অ্যাসিড-ভরা বাতাসের কালের এবং এই কয়লা সেই সময়কার গাছ-গাছড়ারই পরিণতি হইতে পারে, কেননা বনের গাছ-গাছড়াই এখনও ওই কার্বনিক অ্যাসিড শোষণ করিতে ওস্তাদ।

প্রত্যেক কয়লার চাপ ও প্রত্যেকটি দেশলাই যাহা জ্বালানো হয়, তাহা প্রত্যহ আমাদের দরকারি অম্লজান বাষ্প নিঃশেষ করিতেছে।

একজন বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, জগতের অম্লজান ক্রমশই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, এবং বাতাসও সেইজন্য ক্রমেই কলুষিত হইয়া উঠিতেছে, সুতরাং সেদিন আগতপ্রায় – যেদিন পৃথিবীর সমস্ত কিছু কার্বনিক অ্যাসিডময় যুগের জীবে পরিণত হইয়া যাইবে।

মানুষ ক্রমেই ক্ষুদ্র ও দুর্বল হইতে হইতে শেষে লিলিপুটিয়ানদের মতো হইয়া পড়িবে, তার পর একবারেই নেস্তানাবুদ! তারপর আদির মতোই অন্ত! অর্থাৎ প্রথমে যেমন মৎস্য আর সরীসৃপ জাতিই ছিল, পরেও তেমনই য়্যা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহা-মৎস্য আর মহা-সরীসৃপ অবতারগণ বহাল খোশ-তবিয়তে বিরাজ করিবেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের খুব সরু লম্বা ঘৃণ্য সরীসৃপ জাতিও – যেমন, কেঁচো সাপ ইত্যাদি – প্রচুর পরিণামে আবার আমাদের টিপেয় রাজত্ব করিবে।

যদি মানবজাতি বর্তমানের এই অনিষ্টকারী কয়লার মহা-খরচা ছাড়িয়া দেয় (শুধু কয়লা জ্বালানোর জন্যই বৎসরে ১৬০০ মিলিয়ন টন অম্লজান বাষ্প নষ্ট হইতেছে।) এবং তৎপরিবর্তে ইলেকট্রিক দিয়া কয়লার কাজ চালাইয়া লয়, তাহা হইলে আমাদিগকে আবার আর এক নূতন বিপদের মুখ-গহ্বরে পড়িতে হইবে! অর্থাৎ যেদিকেই যাও, নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। জলে কুমির, ড্যাঙায় বাঘ!

আগে হইতে আবহাওয়ার ক্রম-পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। বজ্রাঘাত – বিশেষ করিয়া শীতকালে বজ্রপতন – ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, আর ইহার একদম সোজা কারণ রহিয়াছে যে, পৃথিবীর আর বাতাসের ইলেকট্রিসিটি ঠোকাঠুকি দরুনই এই বজ্র উৎপাতের সৃষ্টি! তাহা হইলে কঃ পন্থা? সেই জন্যই বুঝি পান্নাময়ী আগে হইতেই গাহিয়া রাখিয়াছে, ‘মরিব মরিব সখি, নিশ্চয়ই মরিব!!’

আচ্ছা ধরুন, যদি বায়বীয় ইলেকট্রিসিটির উপরে বর্তমান অপেক্ষা শত বা সহস্র গুণ ভার চাপানো হয় তাহা হইলে আর কি বসন্তে ফুল ফুটিবে – কচি পাতা গজাইবে? আর কি তবে বর্ষার ব্যাকুল বরিষন পৃথিবীর বক্ষ সিক্ত করিবে? না, গো না! তার বদলে বজ্র-পতনই হইবে আমাদের পৃথিবীতে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। রোজ শত শত বজ্রপাতে পৃথিবী ছিন্না-ভিন্না হইয়া যাইবে। একজন ধুরন্ধর উল্কাতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, হাঁ হাঁ, তাহাই হইবে অবশেষে! কী ভয়ানক! আমাদের এখন উচিত যে, আমরা সবাই মিলিয়া প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া বিশ্বাস করি, ও-ভদ্রলোকের কথা মিথ্যা এবং তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। ওই যে আমাদের আলোকদাতা সবিতা সুয্যিমামা – উনি শুধু যে আলো আর উষ্ণতারই সৃষ্টি করেন তা নয়, তিনি ইলেকট্রিক শক্তিরও জনক। আর এই আমাদের একমাত্র মামা যিনি প্রকৃতির এই প্রহেলিকাময় অজানা

শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সব দিক সমঝাইয়া চলিবেন! মামা জীবতু!

বর্তমান সুয্যিমামার ক্ষমতা এত উগ্র প্রচণ্ড যে, যদি এঁর সমস্ত রশ্মি আর উগ্রতা শুধু আমাদের এই গরীব পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে মাত্র দেড়মিনিটের মধ্যেই ওই যে আগে মহা-মহা বরফ-পর্বতের কথা বলিয়াছি, সে সমস্তই গলিয়া টগবগ করিয়া ফুটিত। এবং আরও এগারো সেকেন্ড থাকিলে দুনিয়ার এত বড়ো সমুদ্র, সমস্ত শুকাইয়া ফাটিয়া চৌচির হইয়া হাঁ করিয়া থাকিত।

কিন্তু সুয্যিমামাও দিন দিন সংকুচিত হইয়া ছোটো হইয়া চলিয়াছেন। দৈনিক কতটুকু করিয়া যে তাঁহার বর-বপুর সংকোচন হইতেছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। প্রফেসর বার্নস জোরের সঙ্গে বলেন যে, সুয্যিমামার এই সংকোচন বড়ো জোরেই চলিতেছে। এত জোরে যে আমরা তাহার একটি মোটামুটি ধারণাও করিতে পারি না। অতি অল্প কালের মধ্যেই সূর্যের উত্তাপের কমতি দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, সত্যি সত্যিই সূর্য ছোটো হইয়া যাইতেছে কিনা।

এই রকম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে হইতে যখন সুয্যিমামা পটল তুলিবেন, অর্থাৎ তাঁহার আর অস্তিত্বই থাকিবে না, তখন সে দুর্দশা হইবে পৃথিবীর, তাহার চিন্তাও মহা-ভয়াবহ! যত জল জমিয়া একেবারে পাথরের চেয়েও শক্ত হইয়া উঠিবে, কিন্তু দেখিতে হইবে খাসা – একেবারে হিরের টুকরোর মতন জ্বলজ্বলে!এই যে বাতাস যাহাকে এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা তখন বৃষ্টির মোটামোটা ফোঁটার মতো হইয়া ঝরিয়া পড়িবে। এইসব আবার গহ্বরে গহ্বরে জমিয়া কাচের চেয়েও স্বচ্ছ সরোবরে পরিণত হইবে, কিন্তু তাহাতে ঢেউ খেলিবে না, শুধু নির্বিকার, প্রশান্ত! কেননা তখন বাতাসই যে বহিবে না। সমস্ত পৃথিবী তখন নির্দয় শীতের প্রকোপে জমিয়া স্থির নিশ্চল হইয়া যাইবে । শুধু নীহারিকা আর অস্পষ্ট কুয়াশা!

সূর্য আস্তে আস্তে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে, আবার সারাদিন অমনই রক্তবর্ণ থাকিবে। ঠিক যেন আধ-নির্বাপিত একটা জ্বলন্ত গলিত লৌহপিণ্ড! দিনেই তখন সমস্ত আকাশ আরও উজ্জ্বল তারায় ভরিয়া উঠিবে! আল্লা-হু-আকবর!

লাট-প্রেমিক আলি ইমাম

হায়দ্রাবাদের নিজামের প্রধানমন্ত্রী সার সৈয়দ আলি ইমাম বিলাতে গত ১১ মার্চ রাত্রে লর্ড এবং লেডি রিডিং-এর সম্মানার্থে এক ভোজ দিয়াছিলেন। সেই ভোজসভায় বক্তৃতা দিবার সময় তিনি মি. মন্টেগুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন, মি. মন্টেগু ভারতের কল্যাণের জন্য, মুক্তির জন্য প্রবল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও ভীষণ যুদ্ধ (অবশ্য বাকযুদ্ধ) করিয়াছেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ আশ্চর্য তৎপরতার সহিত গত ১৯১৪ সালের মহাবিপদের সময় ভারতীয় সৈন্যদিগকে চটপট আসরে নামাইয়া ভারতীয়দিগের ভীষণ রাজভক্তির কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন। লর্ড রিডিং ভারতের লাটগিরি করিতে স্বীকৃত হইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন! তাঁহার এই নিঃস্বার্থ বলিদানে ভারত কৃতার্থ হইয়া যাইবে! ভারতের বর্তমানে যে সংকটাপন্ন অবস্থা, তাহাতে এই রকম একজন গুণসম্পন্ন প্রতিভান্বিত ইংরাজ রাজপুরুষের ভয়ানক দরকার ছিল। তিনি লর্ড রিডিংকে ভরসা দিয়া আরও বলেন যে, ভারতের জন্য বা সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহাতেই তিনি (না ডাকিতেই) গিয়া হাত লাগাইতে পিছ-পা নন।... লর্ড রিডিং প্রত্যুত্তরে বলেন, 'আমি সার আলি ইমামের সব নয়। (অ্যাঁ,– যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!) যে কোনো মহাপুরুষই হউন, ত্রিশ কোটি লোকের উপর হর্তাকর্তা বিধাতা হওয়াটা তাঁহার পক্ষে বড়ো সোজা কথা নয়। পরম করুণাময় চরম প্রসন্ন না হইলে কোনো ভায়ার এ (গয়াসুরের) পাদপদ্ম লাভ হয় না। (অত্যধিক আনন্দে 'মনে মনে' ঈশ্বরকে নমস্কার!) মস্ত বড়ো একটা

বিরাট রকমের মহাপদ-প্রাপ্তির জন্য আমি লাটের মলাটে নিজের নাম লিখাইতে রাজি হই নাই, আমাকে ওই পদের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক ভাবিয়া লাট নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া আমার এই স্বার্থত্যাগ!' লর্ড রিডিং এইখানেই না থামিয়া হুড়মুড় করিয়া আরও বলিতে থাকেন যে, তিনি যে এত বিস্তৃততর একটা স্থান ও কাজ দেখাইবার সুযোগ পাইলেন ইহার জন্য তিনি গর্বিত। এইবার তিনি দেখাইয়া দিবেন যে, তাঁহার কার্যক্ষমতা কত বেশি। এতদিন তাঁহাকে আইন অনুসারে বিচার নিষ্পত্তি করিতে হইয়াছে, কিন্তু এইবার তিনি বিবেক দিয়া বিচার করিতে পারিবেন। তাই এই ভারতত্রাতার পদমঞ্জুরি। তিনি 'বহু আশা করিয়া' ভারত-যাত্রা করিতেছেন যে, ভারত পৌঁছিয়াই তিনি দেশব্যাপী এমন এক জলবায়ুর সৃষ্টি করিয়া ফেলিবেন, যাহাতে গবর্নমেন্ট আর ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে পরস্পরের একটা সহানুভূতিপূর্ণ বোঝাপড়া বা লেখাপড়া হইয়া যাইবে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে প্রজাপালন করিবেন বলিয়া তিনি মহৎ আশা করেন! আশ্চর্য কথাই কী না শুনিলাম! তাঁহার স্কন্ধে কত বড়ো দায়িত্বের জোয়াল চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ভাবিয়া তিনি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় কাতর মিনতি জানাইবেন, যেন তিনি তাঁহার ওই গর্দানের জোয়ালোপযুক্ত হন!

মি. মন্টেগু তখন উঠিয়া নিজামের, তাঁহার প্রধানমন্ত্রী সার আলি ইমাম সাহেবের ও তাঁহার বেগম সাহেবার স্বাস্থ্য কামনা করিয়া ...নিজাম যে গত যুদ্ধের সময় লোক-লশকর গোলাগুলি দিয়া ইংরাজের ইজ্জত রক্ষা করেন, তজ্জন্য খুব গরমাগরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। যদিও ভারতের অবস্থা এখন জটপাকানো জটার মতোই জটিলতাপূর্ণ, তবুও তাঁহার আশা আছে, এ-সব জট খুলিয়া যাইবে, এবং ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে একটা নূতন যুগের নব প্রেরণার আজানুলম্বিত বাহুর আবির্ভাব হইয়া পরস্পরকে নিবিড় প্রেমে জড়াজড়ি করিয়া কষিয়া বাঁধিবে!

ইহার উপরে আর আমাদের কথা নাই! এ যেন একেবারে 'দুধকে দুধ, জলকে জল!'

সবাই তো নিজের নিজের মনের মতন কথাগুলি দিব্যি আওড়াইয়া গেলেন, কিন্তু যাহাদের জন্য এত নাড়ির টান ইঁহাদের, তাহাদের কেমন লাগিল বা লাগিবে সেটা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? রাজতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র বা আমলাতন্ত্রের মজাই হইতেছে এই যে, কর্তারা কেবল নিজের দিকটাই দেখেন। নিজেদের সুখ-সুবিধাটাই তাঁহাদের লক্ষ্য – বাকি সব চুলোয় যাক, তাঁহাদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই!

সার আলি ইমাম এখন লাট হইবার আশায় কত রকম ঢলানই ঢলাইবেন, এবং কর্তাদের মনস্তুষ্টির জন্য কত রকমেই না পুচ্ছ নাড়িয়া নিজের কৃতজ্ঞতা ও প্রভুভক্তি জানাইবেন, কিন্তু সে আশা কি সফল হইবে শেষ পর্যন্ত? ভারতের বিনা-জবাবদিহির লাট-মসনদে বসা লইয়াও তিনি যাঁহার নিঃস্বার্থ ত্যাগ দেখিয়া বিনাইয়া-বিনাইয়া গুণ ব্যাখ্যা করিলেন বা খোত্‌বা পড়িলেন, তিনিই কি না তাঁহার মুখের উপর এমন অপমানটা করিয়া বসিলেন, "না ভাই, না এতে আমার স্বার্থত্যাগের কোনো সুগন্ধই নাই – আমি বুদ্ধদেব নই; ত্রিশ কোটি মানুষ-মেষের রাখাল, পঞ্চাশটি হাজার করে টাকা মাসোহারা (যা দিয়া ইংলণ্ডে দু-পাঁচটা লয়েড জর্জ কিনতে পাওয়া যায়), এ কী ভাই সবই ফাঁকি , স লভ্য কি গেছ ভুলে?" লর্ড রিডিং সাংঘাতিক লোক, তাই খাঁটি সত্যকথা (তা যত বড়োই অপ্রিয় হউক না) একেবারে মুখের উপর চাঁচাছোলা ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন! এঁদের কাছে বাবা ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নাই, সোজা কথা। সোজাসুজি বলিয়া দেওয়া, – ব্যস! ইহাতে তুমি রাগো, তো ঘরে বেশি করিয়া ভাত খাইবে! এ তো আর এদেশি রাজা-মহারাজ নন যে, দুটো চাটুবাক্যের আঁচ দিয়াই তাঁহাদিগকে ননীর মতন গলাইয়া ফেলিবে!

সার আলি ইমামকে শুধু জিজ্ঞেস করি, আমাদের গায়ের দাগগুলো কী এমন করিয়া মাখন

ডলিলেই এত শীঘ্র মিলাইয়া যাইবে? –

‘সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলেনি,

তারই যে স্রোতে আঁকাবাঁকা বাঁকা চোখা বাণী,

এখনও গুঁতোর রেখা আছে লেখা পিঠের কূলে! –

আজই জী সবি ফাঁকি, সেকথা কী গেছ ভুলে?’

লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য

(স্মৃতি)

আজ মনে পড়ে সেই দিন আর সেই ক্ষণ – বিকাল আড়াইটা যখন কলিকাতার সারা বিক্ষুব্ধ জনসংঘ টাউনহলের খিলাফত-আন্দোলন-সভায় তাহাদের বুকভরা বেদনা লইয়া সম্রাটের সম্রাট বিশ্বপিতার দরবারে তাহাদের আর্ত-প্রার্থনা নিবেদন করিতেছিল, আর পুত্রহীনা জননীর মতো সারা আকাশ জুড়িয়া কাহার আকুল-ধারা ব্যাকুলবেগে ঝরিতেছিল! সহসা নিদারুণ অশনিপাতের মতো আকাশ বাতাস মন্থন করিয়া গভীর আর্তনাদ উঠিল, – ‘তিলক আর নাই!’ আমাদের জননী জন্মভূমির বীরবাহু, বড়ো স্নেহের সন্তান – ‘তিলক আর নাই!’ হিন্দুস্থান কাঁপিয়া উঠিল – কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। ওরে, আজ যে তাহার বুকে তাহারই হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা ধসিয়া পড়িল! হিন্দুস্থানের আকাশে বাতাসে কোন্ প্রিয়তম-পুত্রহারা অভাগি মাতার মর্মবিদারী কাতরানি আর বুকচাপড়ানি রণিয়া রণিয়া গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল, ‘হায় মেরি ফর্জন্দ (হায় আমার সন্তান) – আহ্ মেরি বেটা!’ এই আর্ত কান্নার রেশ যখন কলিকাতায় আসিয়া প্রতিধ্বনি তুলিল, তখনকার অবস্থা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। এত মর্মভেদী কান্না প্রকাশের ভাষা নাই – ভাষা নাই! মহাবাহু মহাপুরুষ অগ্রজের মৃত্যুতে কনিষ্ঠ ভ্রাতারা যেমন প্রাণ ভরিয়া গলা-ধরাধরি করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে, সেদিন দিনশেষে ব্যাকুল বৃষ্টিধারা মধ্যে দাঁড়াইয়া আমরা তেমনি করিয়া কাঁদিয়াছি! হিন্দু-মুসলমান, – মারোয়ারি, বাঙালি, হিন্দুস্থানি – কোনো ভেদাভেদ ছিল না, কোনো জাতবিচার ছিল না, – তখন শুধু মনে হইতেছিল, আজ এই মহাগগনতলে দাঁড়াইয়া আমরা একই ব্যথায় ব্যথিত বেদনাতুর মানবাত্মা, দুটি স্নেহহারা ছোটো ভাই! এখানে ভেদ নাই! – ভেদ নাই! সেদিন আমাদের সে-কান্না দেখিয়া মহাশূন্য স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে – ঝাঁঝরা আকাশের ঝরা থামিয়া গিয়াছে, – শুধু সে-কার মেঘ-ভরা বেদনাপ্লুত অপলক দৃষ্টি আমাদের নাঙ্গা শিরে স্তব্ধ আনত হইয়া চাহিয়া থাকিয়াছে! তাই মনে হইতেছিল, বুঝি সারা বিশ্বের বুকের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে! এই স্তম্ভিত নিস্তব্ধতাকে ব্যথা দিয়া সহসা লক্ষ কণ্ঠের ছিন্ন-ক্রন্দন কারবালা-মাতমের (কারবালা শোকোচ্ছ্বাস) মতো মোচড় খাইয়া উঠিল, ‘হায় তিলক!’ ওরে, এ কোন্ অসহনীয় ক্রন্দন? হায়, কাহার এ রুক্ষ কণ্ঠের শ্রান্ত রোদন? – মনে পড়ে, সমস্ত বড়োবাজার ছাপাইয়া হ্যারিসন রোডের সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া রোরুদ্যমান লক্ষ লক্ষ লোক – মাড়োয়ারি, বাঙালি, হিন্দু-মুসলমান, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, কন্যা – শুধু বুক চাপড়াইতেছে, ‘হায় তিলকজি! আহ্ তিলকজি!’ মৃত্যুর অমাভরা শত শত কৃষ্ণ পতাকা পশ্চিমা-ঝঞ্ঝায় থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, আর তাহারই নিম্নে মাল্য-চন্দন বিভূষিত বিগত তিলকের জীবন্ত প্রতিমূর্তি! তাহাই কাঁধে করিয়া অযুত লোক চলিয়াছে জাহ্নবীর জলে বিসর্জন দিতে। বাড়ির বারান্দায় জানালায় থাকিয়া আমাদের মাতা-ভগিনীগণ এই পুণ্যাত্মার আলেখ্যের উপর তাঁহাদের পূত অশ্রুরাশি ঢালিয়া ভাসাইয়া দিতেছিলেন। বলিলাম, ধন্য ভাই তুমি! এমনই মরণ, সুখের মরণ, সার্থক মরণ যেন আমরা সবাই মরতে পারি! তোমার

চিরবিদায়ের দিনে এই শেষ আশিস-বাণী করিয়া যাও ভাই, এমনই প্রার্থিত মহামৃত্যু যেন এই দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর প্রত্যেকেরই হয়!.....ওরে ভাই, আজ যে ভারতের একটি স্তম্ভ ভাঙিয়া পড়িল! এ পড়-পড় ভারতকে রক্ষা করিতে এই মুক্ত জাহ্নবীতটে দাঁড়াইয়া, আয় ভাই, আমরা হিন্দু-মুসলমান কাঁধ দিই! নহিলে এ ভগ্নসৌধ যে আমাদেরই শিরে পড়িবে ভাই! আজ বড়ো ভাইকে হারাইয়া, এই একই বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া, একই লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিয়া যেন আমরা পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করি! মনে রাখিও ভাই, আজ মশানে দাঁড়াইয়া এ স্বার্থের মিলন নয়, এ-মিলন পবিত্র, স্বর্গীয়! ওই দেখ, এ-মিলনে দেবদূতরা তোমাদের নাঙ্গা-শিরে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। মায়ের চোখের জলেও হাসি ছলছল করিতেছে!

শ্যাম রাখি না কুল রাখি

বিহারের শাসনকর্তা লর্ড সিংহ বাহাদুর ভয়ানক মুশকিলে পড়িয়া গিয়াছেন। ঠিক যেন সাপে ছুঁচো গেলা গোছ। ছাড়িতেও পারেন না, গিলিতেও পারেন না। সহযোগিতা বর্জন আন্দোলন বিহারে যেরকম জোরে চলিতেছে, সেরূপ আর কোথাও নয়। মহাত্মা গান্ধিও এই লইয়া সেদিন 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' বিহারের জোর প্রশংসা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বিহার গবর্নমেন্ট দস্তুর মতো বেসামাল হইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা ইহার ছোটো শাসন-কর্তারা রাগের বা ভয়ের চোটে যখন তখন যা-তা করিয়া বসিতেছেন। সেদিন পুরুলিয়ায় ডেপুটি কমিশনার উকিলদিগকে ধমকাইতে গিয়া অপ্রতিভের একশেষ হইয়াছেন। তার পর মহকুমায়-মহকুমায়, জেলায়-জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটগণ যে রকম সৃষ্টিছাড়া হুকুম জারি করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বুঝা যায় যে, বাস্তবিকই এবার তাঁহারা চটিয়াছেন। মদের উপকারিতা লইয়া যে সরকারি ইস্তাহার জারি হইয়াছিল, তাহার কেলেঙ্কারি আর বলিলাম না। লর্ড সিংহ বাহাদুর বড়ো অসময়ে লাট ও শাসনকর্তা হইয়াছেন। এখন তিনি দেশের লোকের মন জোগাইয়া চলিতে পারেন না, আবার তাঁহার অধীন বিলিতি শাসনকর্তাদিগকেও জোর করিয়া কিছু বলিতে পারেন না, পাছে তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিয়া বসেন! দেশের লোক এখন যাহা চায়, তাও যদি আবার তিনি বিনা বাধায় চলিতে দেন, তাহা হইলে তো আবার তাঁহাকে একদিনেই পাততাড়ি গুটাইতে হয়।

আর তাহা ছাড়া দেশের লোকের বর্তমান দাবি-দাওয়া পূর্ণ করাও তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে। একটা প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে আমরা যতটা স্বাধীন মনে করি, আসলে তিনি ততটা স্বাধীন নন। তিনিও প্রকারান্তরে শুধু তাঁহার উপরওয়ালারই হুকুম তামিল করেন, বলা যাইতে পারে। কাজেই বুঝিয়া হউক, না বুঝিয়া হউক, দেশের লোকে তাঁহার উপর বিষম চটিয়া উঠিতেছে এবং নানান রকমের টীকাটিপ্পনীও কাটিতেছে! এ হুলের বিষজ্বালা তাঁহাকে অতি কষ্টে নীরবেই সহ্য করিতে হইতেছে, কেননা, আমরা ছেলেবেলার পদ্যপাঠে পড়িয়াছি, 'অসহ্য জ্ঞাতির বাক্য সহ্য নাহি হয়, সাপের মাথায় যেন ব্যাঙে প্রহারয়!' কিন্তু ইহাতে তাঁহার দুঃখ-কষ্ট অনুভব করা উচিত নয়। কেননা, সর্বপ্রথম দেশীয় শাসনকর্তা বলিয়া দেশের লোক তাঁহার নিকট অনেক কিছু আশা করিয়াছিল। কিন্তু কর্মের বা গ্রহের ফেরে সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। এখন তিনি দেশের লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না এবং খুব কষিয়া কড়া শাসন চালাইয়া তাহাদিগের মুখ বন্ধ বা তাহাদের দোরস্ত করিতেও পারেন না। কেননা, বেশি জোরজবরদস্তি করিলে দেশের লোক আরও বেশি খেপিয়া উঠিবে। মানুষের চামড়া কিছু গণ্ডারের চামড়া নয়, অতএব দেশ-ভাই-এর ও আঘাত হয়তো তাঁহার গায়ে দারুণ বাজিবে। আজ যদি বিহারের শাসনকর্তা কোনো ইংরেজ হইতেন, তাহা হইলে হয়তো দেশবাসী বিহার লইয়া এত বেশি আলোচনা করিত না। অথবা তিনি যে প্রদেশেরই লাট হইতেন, সেই প্রদেশের শাসন ইত্যাদি ব্যাপারে দেশের লোক বেশি করিয়া চোখ রাখিত। দেশীয় শাসনকর্তার নিকট দেশ-ভাই-এর একটু বেশি অধিকারের দাবি বাড়াবাড়ি বোধ হইলেও অন্তত অন্যায় নয়।

এ তো গেল এদিককার কথা। অন্য পিঠ – অর্থাৎ তাঁহার অধীন ইংরেজ শাসনকর্তারা যত বেশি প্রভুভক্তি ও কর্মকুশলতাই দেখান না কেন, এদেশি ‘নেটিভ’ শাসনকর্তার অধীন হইয়া থাকিতে তাঁহাদের মর্মস্থলে বেশ একটু বাজে এবং হিংসাও হয়। ইউরোপীয় গবর্নর থাকিলে তাঁহারা (বিশেষ করিয়া বিহার প্রদেশ বলিয়া) অনায়াসে দেশি লোককে নেটিভ, নিগার ইত্যাদি বলিয়া এ-গোলমালে খুব একচোট গালি-গালাজ করিয়া গায়ের ঝাল আর রসনার চুলকানি মিটাইতেন। কিন্তু এখন আর ও রকম গালি-গালাজ দিতে পারিবেন না, কেননা তাহা হইলে প্রকারান্তরে লর্ড সিংহকেই গাল দেওয়া হইবে। অথচ তাঁহারা এটুকুও বুঝিয়াছেন যে, ইউরোপীয় শাসনকর্তার আমল অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর স্বাধীনভাবে এখন দেশকে শাসাইতে পারিবেন। কেননা, যতই হোক দেশীয় গবর্ণর তো! তিনি কিছুতেই ইহাদের এই নীতিকে একদম বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন না। কেননা তখন এই ইউরোপীয় ‘ডিমিনিউটিভ’ শাসনকর্তারা দল বাঁধিয়া ইহার বিরুদ্ধে হই রই মার লাগাইয়া উপরওয়ালার কানে ঝালাপালা লাগাইয়া দিবে। এই সব এবং এই রকম আরও নানান গতিকে লর্ড সিংহ বাহাদুর চুপ করিয়া ভাবিতেছেন, ‘শ্যাম রাখি কী কুল রাখি!’ তিনি এখন প্রাণপণে দু-নৌকায় পা দিয়া আছেন বলিলেই হয়। কেননা, এখন তিনি হতাশ হইয়া বলিতেছেন, প্রকারান্তরে আমি গান্ধিজিকে সমর্থন করিতেছি। তাঁহার মতো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করাই আমার কাজ।

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই যেরকম বিগড়াইয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহার আর এ ‘ন যযৌ ন তস্থৌ’ ভাব চলিবে না।

আমরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছি না, বরং তাঁহার এ ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। দোষ তাঁহারও নয়, আমাদেরও নয়, এ দোষ বুরোক্রাসির বা স্বেচ্ছাতন্ত্রের।

যতক্ষণ দেশের আদত শাসনকর্তা স্বেচ্ছাতান্ত্রিক, যতক্ষণ দেশ পরাধীন থাকে, ততক্ষণ দেশীয় ছোটোখাটো শাসনকর্তারা কিছুতেই লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। আজ যদি লর্ড সিংহ ভারতের বড়োলাটও হন, তাহা হইলে তিনি দেশের জন্য তেমন কিছু করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে অধিকাংশ সময়েই তাঁহার বিবেক-বিরুদ্ধ কার্য করিতে হইবে। দেশীয় লোক যত বড়ো পদই পান, তবু তিনি যে দেশীয় বা ‘নেটিভ’ একথা ইংরেজ কর্তারাও ভুলিবেন না, আর তিনি নিজেও ভুলিতে পারিবেন না। আজ যদি লর্ড সিংহ একটু দেশের লোকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন, তাহা হইলে সকলে বুঝিতে পারিবেন, ইংরেজ মন্ত্রীর দল কীরকম আপিস-তাপিস করিয়া উঠেন। তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন – ‘এক যাত্রায় পৃথক ফল!’ এ দোষ কাহারও নয় ভাই – দোষ আমাদের এই কালো চামড়ার!

সত্য-শিক্ষা

তোরণে তোরণে ভৈরব-বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে – ‘জাগো পুরবাসী!’ দিকে দিকে মঙ্গল শঙ্খে তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিয়া আমাদের রক্তে রক্তে ছায়ানটের নৃত্যরাগ তুলিয়াছে। এই যে আমাদের জীবনের উন্মাদ নট-নৃত্য, এ শুধু বিশ্বের কল্যাণ-মুক্তিতে নয়, এই মুক্তি-যুগে আমরাও আমাদের ভাবী সিংহ-দ্বারের পূর্বতোরণে নহবতের বাঁশি শুনিয়াছি বলিয়া। তাই আর আমরা শুধু দার্শনিকের ভিতরের যুক্তিতে সন্তুষ্ট নই, এখন চাই বাইরের ব্যবহারিক জীবনে মুক্তি। এই ‘আজাদি’র সাড়া না পাইলে আমাদের জীবনে আজ এমন তরুণের উচ্ছৃঙ্খলতা, সবুজের স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিত না। রক্তনিশান লইয়া আজ আমাদের নূতন করিয়া যাত্রা শুরু; এই শোভাযাত্রার দুর্মদ অগ্রযাত্রী আমাদের যে কিশোর আর তরুণের দল, সর্বাগ্রে তাহাদিগেরই অন্তরে বাহিরে ‘আজাদি’র নেশা জমাইয়া তুলিতে হইবে। কারণ, ইহাদের

মৃত্যুবিদ্রোহে অলস ভীরু জীবন পথযাত্রীর বুকে সাহস সঞ্চর হইবে। আমরা কিন্তু আমাদের এই উন্মুক্ত উদার প্রাণগুলির চারিপাশে নিত্য বন্ধন-বাধা সৃজন করিয়া তাহাদিগের উচ্ছল গতিকে অচল করিতেছি। তাই বিজাতির বিভিন্ন শৃঙ্খল কাটিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া আমরা আজ এত আনন্দধ্বনি করিতেছি। যাহাতে এই জাগরণ-যুগের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বাহিরে না হইয়া অন্তরে হয়, সেই জন্যই আমরা এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। আজ ইংরাজের সহযোগিতা বর্জন করিতেছি বলিয়াই যে রাগের মাথায় যেন-তেন-প্রকারেণ দুই-একটা ঠাটকবাজিগোছ জাতীয় স্কুল-কলেজ দাঁড় করাইয়া সরিয়া পড়িতে হইবে, তাহা নয়; অসহযোগিতার মৌসুম না আসিলেও জাতীয়তার দিক দিয়া আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ 'হনুকরণে' পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ভালো-মন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়ায়, আত্মা, নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে নেহাতই খর্বই করা হয়। নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা। স্বদেশের মাঝেই বিশ্বকে পাইতে হইবে, সীমার মধ্যেই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। তাই, এই সহযোগিতা বর্জনের দিনে 'খোশখবর কা ঝুটা ভি আচ্ছা' স্বরূপ আমাদের দীর্ঘ পরিপোষিত আশার কার্যে পরিণত হইবার কথা শুনিয়া গভীর তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।

জাতীয় বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ভাবী দেশসেবকের চরিত্র ও জীবন গঠিত হইবে, বিদেশের বিজাতীর বিষাক্ত বাষ্প লাগিয়া তাহাদের মঞ্জরিত জীবন-পুষ্প শুকাইয়া যাইবে না, বলপ্রয়োগে তাহাদিগকে মিথ্যা স্বজাতি-স্বদেশে-অনাস্থা শিখাইয়া আত্মশক্তিকে অবিশ্বাসী অলস অকেজো করিয়া তোলা হইবে না, – ইহা কী কম সুখের কথা! তাহারা শিখিবে দেশের কাহিনি, জাতির বীরত্ব, ভ্রাতার পৌরুষ, স্বধর্মের সত্য – দেশের ভাইয়ের কাজ হইতে – তাহারা শিখিবে বীরের আত্মোৎসর্গ, কর্মীর ত্যাগ ও কর্ম, নির্ভীকের সাহস, দেশের উদাহরণে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া, – ইহা কী কম আনন্দের কথা! তাই আবার বলিতেছি, শুধু হুজুগে মাতিলে চলিবেনা, গলাবাজির চোটে স্টেজ ফাটাইয়া তুলিলে হইবে না, – আমরা দেখিতে চাই কোন্ নেতার চেষ্টায় কোন্ দেশ-সেবকের ত্যাগে কতটা জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল। আমরা দেখিতে চাই, আমাদের কতগুলি তরুণের বুকে এই মহাশিক্ষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল! আমরা দেশ-সেবক চিনিব ত্যাগে, বক্তৃতায় নয়। আমরা দেখিতে চাই কবির ভবিষ্যদ্‌বাণী – 'আসিবে সে দিন আসিবে' গান দিকে দিকে বৈতালিক-কণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছে, – 'দিন আগত ওই!'

***